# মহাত্মা গান্ধীর শান্তি-অভিযান

শ্রীগোপালচন্দ্র রায়

প্রকাশক
বঙ্গবাসী লিমিটেড
২৬ পটল ডাঙ্গা ষ্ট্রীট
কলিকাতা

প্রথম প্রকাশ
১৩৫৪—চৈত্র
১৯৪৮—এপ্রিল

প্রিণ্টার
শ্রীগোবিন্দপদ ভট্টাচার্য
শৈলেন প্রেস
৪, সিমলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা

# উৎসর্গ

সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সময় যে সব হিন্দু ও শিখ হাঙ্গামার ব্যাপারে জড়িত না হয়ে, নিজ নিজ সম্প্রদায়ের কাছ থেকে সমূহ বিপদের সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও মুসলমানদের রক্ষা করেছিলেন এবং ঠিক ঐভাবেই যে সব মুসলমান, হিন্দু ও শিখদের জীবন বাঁচিয়েছিলেন, সেই সব মহান্ হৃদয় ব্যক্তিদের হাতেই বইখানা উৎসর্গ করলাম।

গ্রন্থকার

# নিবেদন

নোয়াখালি ও ত্রিপুরার হাঙ্গামায় মর্মপীড়িত হয়ে মহাত্মা গান্ধী দুর্গতদের চোখের জল নিজ হাতে মোছাবার এবং অত্যাচারীদের হৃদয়ের পরিবর্তন আনবার পণ ক'রে, শান্তি ও মৈত্রীর বাণী নিয়ে যখন উপক্রুত অঞ্চলের গ্রামে গ্রামে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন, তখন তাঁর সেই ঐতিহাসিক শান্তি-অভিযান দেখার জন্য পৃথিবীর নানা দেশ থেকে লোকে সেখানে ছুটে গিয়েছিল। মহাত্মার পাদস্পর্শে ধন্য নোয়াখালি ও ত্রিপুরার সেই পুণ্যতীর্থে গিয়ে তাঁর শান্তি-অভিযান দেখার জন্য সেই সময়ে আমিও অত্যন্ত আগ্রহান্বিত হ'য়ে উঠেছিলাম। "ভারতবর্ষ"-সম্পাদক অগ্রজ-প্রতিম শ্রীযুক্ত ফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এবং সোদপুর খাদি-প্রতিষ্ঠান আশ্রমের ম্যানেজার শ্রীযুক্ত বিশ্বনাথ নাথ এঁরা আমার নোয়াখালি যাওয়ার ব্যবস্থা ক'রে দিয়েছিলেন। এরই ফলে খাদি-প্রতিষ্ঠানের অন্যতম ট্রাষ্টী ও মহাত্মা গান্ধীর একান্ত ভক্ত শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্র মোহন দত্তের সঙ্গে নোয়াখালি গিয়েছিলাম। জিতেনদার সঙ্গে নোয়াখালি ও ত্রিপুরায় গান্ধীক্যাম্প সমূহের হেড কোয়ার্টার কাজিরখিল গান্ধী-ক্যাম্পে গিয়ে পৌঁছলে, গান্ধী-ক্যাম্প সমূহের পরিচালক, মহাত্মা গান্ধীর প্রিয়শিষ্য শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র দাসগুপ্ত মহাশয় তাঁর জীপে নিয়ে আমাকে নোয়াখালি ও ত্রিপুরার বিধ্বস্ত অঞ্চল দেখিয়েছিলেন এবং মহাত্মা গান্ধীর সন্নিকটে নিয়ে গিয়েছিলেন। পূর্ববঙ্গ ছাড়া কলকাতায় শান্তি-অভিযানের সময়েও মহাত্মা গান্ধী যখন সোদপুরে অবস্থান করছিলেন, তখন সোদপুর খাদি-প্রতিষ্ঠান আশ্রমেও কয়েকদিন ছিলাম। শ্রদ্ধেয় সতীশবাবু, জিতেনদা, ফণিদা ও বিশ্বনাথদা, এঁদের সহায়তায়, এ যুগের পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব মহাত্মা গান্ধীর সংস্পর্শে যাওয়ার এবং পূর্ব-বাঙ্গলায়

ও কলকাতায় তাঁর শান্তি-অভিযান প্রত্যক্ষ করবার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। তাই এঁদের কাছে আমি চির-কৃতজ্ঞ।

অমৃতবাজার ও যুগান্তর পত্রিকার ফটোগ্রাফার তারক দাস ও পান্না সেন, দৈনিক ভারতের কর্তৃপক্ষ ও ভারতের ফটোগ্রাফার মনুজ দাস এবং দিল্লীর স্টেট্‌সম্যান পত্রিকার সাহিত্যিক-বন্ধু শ্রীশচীন্দ্র নাথ গুপ্ত এঁরা বই-এর মধ্যেকার ছবিগুলোর ফটো দিয়েছেন। এঁদের কাছেও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

গ্রন্থকার

# সূচীপত্র

# মহাত্মা গান্ধীর শান্তি-অভিযান

## নোয়াখালি ও ত্রিপুরায়

১৯৪৬ খৃষ্টাব্দের ২৯শে জুলাই নিখিল ভারত মুসলিম লীগ কাউন্সিল বোম্বাই অধিবেশনে বৃটিশ মন্ত্রীমিশনের গণ-পরিষদ ও অন্তর্বর্তী সরকার গঠন, এই উভয় প্রকার প্রস্তাবই প্রত্যাখ্যান ক'রে প্রতিবাদ জানাবার জন্য ১৬ই আগষ্ট "প্রত্যক্ষ-সংগ্রাম" দিবস ঘোষণা করে। শান্তিপূর্ণভাবে এই বিক্ষোভ দিবস পালন করা হবে, লীগ-নেতাদের এরূপ আশ্বাসদান সত্বেও "প্রত্যক্ষ-সংগ্রাম" দিবসে লীগ সমর্থকরা ভারতের প্রায় সর্বত্রই একটা ভীষণ হাঙ্গামার সৃষ্টি করে। ফলে দেশজুড়ে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে ঘোরতর সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সুরু হয়। ১৬ই আগষ্ট থেকে ২০শে আগষ্ট মাত্র এই ক'দিনেই শুধু কল্‌কাতার দাঙ্গায় ৫ হাজার লোক নিহত ও ১০ হাজার লোক আহত হয় এবং লোকের প্রায় ১০ কোটী টাকার সম্পত্তি লুন্ঠিত হয়। ১৬ই আগষ্টের বহু পর পর্যন্তও এই দাঙ্গার জের মিট্‌ল না। দেশের সর্বত্রই এই সংগ্রাম ছোটবড় আকারে একপ্রকার লেগেই রইল। ১০ই অক্টোবর থেকে সপ্তাহাধিক কাল ধ'রে লীগ শাসিত বাঙ্গলার নোয়াখালি ও ত্রিপুরা জেলায় এই সংগ্রাম যে নৃশংস আকার ধারণ করে, তার কাছে প্রত্যক্ষ-সংগ্রামে কল্‌কাতা ও অন্যান্য স্থানের নারকীয় হত্যাকাণ্ডও ম্লান হয়ে গেল। সেখানে সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমান সম্প্রদায়ের হাতে, সংখ্যা-লঘিষ্ঠ হিন্দুরা ধন, ধর্ম, মান, প্রাণ হারিয়ে যারপর নাই

ক্ষতিগ্রস্ত হ'ল। লুণ্ঠন, অগ্নিসংযোগ, হিন্দুদিগকে হত্যা, হিন্দুনারী হরণ ক'রে জোরপূর্বক বিবাহ, হিন্দুদের দেবমন্দির ধ্বংস করা ও হিন্দুদের গোমাংস ভক্ষণ করান অবাধে চল্‌ল। দুর্বৃত্তদের হাত থেকে যে ক'জন কোনরূপে রক্ষা পেল, তারা সর্বস্ব ত্যাগ ক'রে, শুধু প্রাণ নিয়ে ভয়ে অন্যত্র চলে গেল।

নোয়াখালি জেলার সাহাপুর গ্রামেই এই হাঙ্গামার প্রথম সূত্রপাত। ১০ই অক্টোবর বেলা ১০টার সময় সাহাপুর বাজারে প্রায় ১৫ হাজার মুসলমানের এক সভা হয়। সভার কাজ শেষ হ'লেই প্রথমে বাজারের একটা কামারের দোকান লুঠ করা হ'ল। তারপর ব্যাপকভাবে লুঠ-তরাজ ও গৃহদাহ সুরু হযে গেল। বৈকালে দুর্বৃত্তরা পুনরায় একত্র মিলিত হ'ল এবং পরে দুটো দলে বিভক্ত হয়ে পড়্‌ল। একটা দল গেল নারায়ণপুরের দিকে, অপরটা গেল দাসগড়ের দিকে। পরদিন ১১ই অক্টোবর থেকে নোয়াখালি ও ত্রিপুরা এই দুটো জেলা জুড়েই হিন্দুদের হত্যা, নির্যাতন, তাদের সম্পত্তি লুণ্ঠন, হিন্দুনারী হরণ, হিন্দুদের বলপূর্বক ধর্মান্তরিত করণ চল্‌তে থাকল। ভূতপূর্ব এম, এল, এ, ও স্থানীয় লীগ নেতারা এই আক্রমণের নেতৃত্ব করতে লাগলেন। সপ্তাহাধিক কাল ধ'রে এই অত্যাচার চল্‌ল। বাইরের লোক যাতে সহজে উপদ্রুত অঞ্চলে না যেতে পারে, তার জন্য দুর্বৃত্তরা পুল ও বাঁধগুলো ভেঙ্গে দিয়ে, নোয়াখালি ও ত্রিপুরাকে বাইরের জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন করে রাখ্‌ল। এইভাবে নোয়াখালি ও ত্রিপুরায় সেখানের মুসলমানদের সুপরিকল্পিত আক্রমণ ঘটে যাবার কয়েকদিন পরে সেখানের সংবাদ প্রকাশিত হ'ল।

পূর্ব বাঙ্গলার এই মর্মান্তিক সংবাদ প্রকাশিত হ'লে, বাঙ্গলা ও বাঙ্গলার বাইরের জাতীয় নেতারা বিচলিত হয়ে উঠ্‌লেন। অনেকেই পূর্ব বাঙ্গলায় গিয়ে উপস্থিত হ'লেন। নেতারা গিয়ে পুলিশ ও

মিলিটারীর সাহায্যে বহু হিন্দুনারীকে মুসলমান পরিবার থেকে উদ্ধার করলেন এবং মুসলমান ধর্মে ধর্মান্তরিত অনেক হিন্দু পুরুষকে আশ্রয়প্রার্থী শিবিরে নিয়ে গেলেন।

নোয়াখালি ও ত্রিপুরার এই নিদারুণ সংবাদে মহাত্মা গান্ধী তীব্র বেদনা অনুভব করলেন। তিনি তখন ছিলেন নয়াদিল্লীতে। তিনি বাঙ্গলার এই দুর্গত অঞ্চলে আসবার জন্য অত্যন্ত চঞ্চল হয়ে উঠলেন। এই সময়ে তাঁর জনৈক বন্ধু তাঁকে দীর্ঘপথ ভ্রমণে নিবৃত্ত করতে চাইলে, তাঁকে তিনি বললেন—জানিনা বাঙ্গলায় গিয়ে আমি কি ক'রতে পারব, তবে এইটুকু জানি যে, বাঙ্গলায় না গেলে, আমি হৃদয়ে একটুও শান্তি পাব না।

২৭শে অক্টোবর মহাত্মা গান্ধী নয়াদিল্লীতে তাঁর প্রার্থনা সভায় বললেন—আগামী কাল প্রাতে আমি কলকাতা যাচ্ছি। ঈশ্বর আবার যে কবে আমাকে নয়াদিল্লীতে আনবেন জানি না। কলকাতা থেকে নোয়াখালি যাব স্থির করেছি। যাত্রাপথ মোটেই সহজ নয়, তদুপরি আমার স্বাস্থ্যও খারাপ। তবে আমাদের যা কর্তব্য তা ত করতেই হবে। ঈশ্বরে বিশ্বাস রাখতে হবে, তা হ'লেই তিনি কঠোর পরিশ্রম করবার মত শক্তি দেবেন। কা'রও বিচার করতে আমি বাঙ্গলায় যাচ্ছি না। জনগণের সেবক হিসাবেই আমি যাচ্ছি। সেখানে গিয়ে আমি হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়েরই লোকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করব। আমি আমার ১৭ বছর বয়স থেকেই এই শিক্ষালাভ করেছি যে, জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে সকল দেশের লোকই আমার আত্মীয়। ঈশ্বরের সেবক হ'তে হ'লে আমাদের তাঁর সৃষ্ট জীবের সেবক হতে হবে। সেই সেবকের অধিকার নিয়েই আমি বাঙ্গলায় যাচ্ছি। সেখানে গিয়ে আমি হিন্দু-মুসলমান মিলনের কথাই প্রচার করব। বলব—হিন্দু ও মুসলমান কেহ

কা'রও শত্রু হ'তে পারে না। একই দেশে তাঁরা লালিত পালিত হয়েছেন, একই দেশে তাঁরা জীবন যাপন করবেন এবং একই দেশে তাঁরা দেহত্যাগ করবেন। ধর্মের পার্থক্য থাকলেও এই আসল সত্যটা পরিবর্তিত হ'তে পারে না।—পূর্ব বাঙ্গলায় নারীর দুর্দশার কাহিনী শুনে আমার হৃদয় বিগলিত হয়েছে। যদি পারি আমি গিয়ে তাঁদের চোখের জল নিজের হাতে মোছাব এবং তাঁদের ভগ্ন-হৃদয়ে আশার সঞ্চার করব। এই কারণেই আমি বাঙ্গলায় যাচ্ছি।

২৮শে অক্টোবর প্রাতে মহাত্মা গান্ধী নয়াদিল্লী থেকে বাঙ্গলার পথে যাত্রা করলেন এবং পরদিন অপরাহ্ণে সোদপুরে শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র দাসগুপ্তের খাদি-প্রতিষ্ঠান আশ্রমে এসে উপস্থিত হলেন। এখানে কয়েক দিন অবস্থান ক'রে তিনি বাঙ্গলার গবর্ণর ও প্রধান মন্ত্রী মিঃ সুরাবর্দীর সঙ্গে পূর্ব-বাঙ্গলার হাঙ্গামা সম্পর্কে আলোচনা করলেন। তারপর ৬ই নভেম্বর প্রাতে একখানা স্পেশাল ট্রেনে ক'রে মহাত্মা গান্ধী সদলবলে নোয়াখালি অভিমুখে রওনা হ'লেন। বাঙ্গলা গবর্ণমেণ্ট মহাত্মার জন্য এই স্পেশাল ট্রেনের ব্যবস্থা করলেন। বাঙ্গলা সরকারের বাণিজ্য-সচিব মিঃ সামসুদ্দীন সাহেব, প্রধান মন্ত্রীর পার্লামেণ্টারী সেক্রেটারী মিঃ নসরুল্লা খাঁ এবং আবদার রসিদও মহাত্মাজীর সঙ্গে পূর্ব-বাঙ্গলায় গেলেন।

মহাত্মা গান্ধীর আগমনবার্তা শুনে গোয়ালন্দ ষ্টীমার ঘাটে লোকের অসম্ভব ভীড় হয়েছিল। মহাত্মা সেখানে সংক্ষেপে তাঁর নোয়াখালি পরিদর্শনের উদ্দেশ্য বুঝিয়ে এক বক্তৃতা করলেন। তিনি বললেন—দুর্গত ও লাঞ্ছিতদের অশ্রু মোচন ক'রে তাদের সান্ত্বনা দেবার জন্যই আমি নোয়াখালি যাচ্ছি। যতদিন না সেখানকার হিন্দু এবং মুসলমানরা বলবে যে আমার সেখানে আর প্রয়োজন নাই—ততদিন আমি সেখানে থাকব।

ঐ দিন রাত্রি সাড়ে আটটায় মহাত্মা গান্ধী চাঁদপুরে গিয়ে উপস্থিত হ'লেন এবং সেখানে রাত্রি কাটালেন। রাত্রে স্থানীয় মুসলিম লীগ ও হিন্দুদের দুইটি দল মহাত্মার সঙ্গে সাক্ষাৎ কর্‌ল। পরদিন সকাল ১০টায় পুনরায় একখানা স্পেশাল ট্রেনে ক'রে মহাত্মা গান্ধী চাঁদপুর থেকে চৌমুহানী যাত্রা কর্‌লেন এবং ঐ দিনই বেলা দ্বিপ্রহরে সেখানে গিয়ে উপস্থিত হ'লেন। পথে লাকসাম ষ্টেশনে তিনি সমবেত জনতার উদ্দেশে বল্‌লেন—আমি তাড়াতাড়ি ঘুরে চলে যাবার জন্য এখানে আসি নাই। আমি এখানে আপনাদের মধ্যে বাস কর্‌তেই এসেছি। প্রয়োজন হ'লে এখানেই আমি দেহত্যাগ কর্‌ব। যতদিন না একটি হিন্দু বালিকা একাকী নির্ভয়ে মুসলমানদের মধ্যে বিচরণ কর্‌তে পার্‌ছে, ততদিন আমি এখানে অবস্থান কর্‌ব।

তারপর তিনি বল্‌লেন—আপনারা অন্তর থেকে ভয় দূর করুন, তাহ'লেই আমাকে সর্বাপেক্ষা সাহায্য করা হবে। যদি আপনারা একান্তভাবে রাম নাম করেন, তাহ'লেই ভয় দূর হবে। রাম নাম কখনও বিফল হয় না। রাম, ঈশ্বর, ভগবান, আল্লা সেই যিনি একমেবাদ্বিতীয়ম্ তাঁরই বিভিন্ন নাম। "আল্লা হো আকবর" ধ্বনিতে আপনাদের ভয় পাবার কিছুই নেই, কারণ আল্লা ত নির্দোষেরই রক্ষক। আপনারা যে বাস্তুতে জন্মেছেন এবং লালিত-পালিত হ'য়েছেন, সে স্থান কিছুতেই ত্যাগ কর্‌বেন না। বরং প্রয়োজন হ'লে নিজের মর্যাদা রক্ষার জন্য বীরের ন্যায় মৃত্যু বরণ কর্‌বেন। বিপদের সম্মুখীন না হ'য়ে বিপদ থেকে পলায়নের অর্থ হ'ল—মানুষ, ঈশ্বর, এমন কি নিজের প্রতিও অনাস্থা জ্ঞাপন করা।

৮ই অপরাহ্ণে চৌমুহানীর মদনমোহন স্কুলের প্রশস্ত প্রাঙ্গণে হিন্দু-মুসলমানের মিলিত এক বিরাট সভায় মহাত্মা গান্ধী বক্তৃতা-প্রসঙ্গে

বল্‌লেন—শুনছি নোয়াখালির কোন হিন্দুনারীই এখানে বাস করায় নিজেকে আর নিরাপদ মনে করছেন না। এক্ষেত্রে এখানের সংখ্যা-গরিষ্ঠ মুসলমান সম্প্রদায়েরই বলা উচিত যে, হিন্দু-নারীর নিজেকে বিপন্ন মনে করার কোন কারণ নেই। তাদের মর্যাদা রক্ষা করা এবং দুষ্কৃতকারীদের শাস্তি দেওয়া সংখ্যা-গরিষ্ঠ সম্প্রদায়েরই কর্তব্য। শান্তি স্থাপনের জন্য পুলিশ বা মিলিটারী ডাকতে হ'লে, এটা হিন্দুদের, বিশেষ ক'রে মুসলমানদেরই লজ্জার কথা। আমি এখানে মুসলমানদের বিরুদ্ধে হিন্দুদের উত্তেজিত করতে আসিনি। আমি আজীবন বৃটিশের সঙ্গেই সংগ্রাম ক'রে আসছি। কিন্তু তবুও তাঁরা আমার বন্ধু। আমি কখনও তাঁদের অমঙ্গল কামনা করি না। শুনছি এখানে মুসলমানরা হিন্দুদের দেবমূর্তি ভেঙ্গে দিয়েছেন। মুসলমানরা মূর্তি পূজা করেন না, আমিও করি না। কিন্তু যাঁরা মূর্তি পূজা করেন, তাঁদের তাতে বাধা দেওয়া উচিত নয়। ঐরূপ ঘটনা ইসলামের পক্ষে কলঙ্ক-স্বরূপ। কোরাণ আমি পড়েছি। কোরাণ শব্দের অর্থ ত হ'ল শান্তি। মুসলমানরা 'সালাম আলেকুম' ব'লে যে অভিবাদন করে, সে ত সব সম্প্রদায়েরই গ্রহণ করার মত। এর অর্থ তোমার মঙ্গল হোক। নোয়াখালি বা ত্রিপুরায় যে সব অনাচার ঘটেছে, ইসলাম ধর্ম তা কখনই সমর্থন করে না।

এই সভায় বাঙ্গলা সরকারের শ্রম ও বাণিজ্য-সচিব সামসুদ্দীন আমেদও বক্তৃতা করলেন। তিনি বল্‌লেন—পূর্ব-বাঙ্গলায় বর্তমানে যে অরাজকতা ঘটেছে, মোগল কিংবা পাঠান আমলেও সেরূপ ঘটে নাই। কোন গবর্ণমেণ্টই এরূপ অত্যাচার বরদাস্ত করতে পারেন না।

তারপর তিনি ত্রিপুরা ও নোয়াখালি জেলার মুসলমানদের কাছে

সংখ্যালঘিষ্ঠ হিন্দুদের মান-সম্মান ও ধন-প্রাণ রক্ষার জন্য আবেদন জানালেন।

৯ই তারিখে মহাত্মা গান্ধী রামগঞ্জ থানার অন্তর্গত গোপেরবাগ গ্রাম পরিদর্শন করলেন। দুর্বৃত্তরা ১৫ই অক্টোবর তারিখে এই গ্রামের এক বাড়ীতে ২২ জন পুরুষের মধ্যে ১৯ জনকে হত্যা করেছিল। প্রাঙ্গণের এককোণে গাদাক'রে পোড়ান মৃতদেহ গুলোর দগ্ধাবশিষ্ট তখনও সেই মর্মন্তুদ ঘটনার সাক্ষ্য দিচ্ছিল। এ ছাড়া গোপেরবাগের বহু বাড়ীতেই মৃতের চিহ্ন, মানুষের রক্তের দাগ চারিদিকে তখনও ছড়িয়েছিল। গোপেরবাগ থেকে প্রত্যাবর্তন কালে মহাত্মা দত্তপাড়া ও অপর একটি গ্রামে গেলেন। সেখানে এক বাড়ীতে ২০ জন পুরুষকে হত্যা করে বাড়ীর উঠানে পুড়িয়ে ফেলা হয়েছিল। মহাত্মাজী দত্তপাড়ার দেওয়ান বাড়ীতে থামলেন। এই বাড়ীতে তখন আশ্রয়-প্রার্থীরা এসে জড়ো হয়েছিল এবং প্রায় ৬ হাজার আশ্রয়প্রার্থী ছিল। মহাত্মা সন্ধ্যায় এখানে হিন্দু-মুসলমানদের এক মিলিত সভায় বক্তৃতা করলেন। বক্তৃতায় তিনি বললেন—হিন্দুরা যেভাবে ঘর ছেড়ে চলে এসেছে, এতে হিন্দু এবং মুসলমান উভয়েরই লজ্জার কথা। মুসলমানদের পক্ষে বিশেষ লজ্জার কথা, কারণ তা'দেরই ভয়ে হিন্দুরা ঐরূপ করেছে। একজন মানুষ আর একজনের ভয়ের কারণ হবে কেন? আমি বরাবরই ব'লে আসছি যে, একমাত্র ভগবান ছাড়া অপর কাকেও ভয় করা কারও উচিত নয়। নোয়াখালি এবং ত্রিপুরায় যা ঘটে গেছে তা ভুলতে চেষ্টা করতে হবে এবং দুষ্কৃতকারীদের ক্ষমা করতে হবে। তাই ব'লে ভীরুর ন্যায় অবনতি স্বীকার করতে আমি বলছি না। আমি এই কথা বলছি যে, কলঙ্কময় অতীতকে বড় ক'রে ধরলে কোন লাভ হবে না। আমি আশা করছি এবং ভগবানের নিকটে এই প্রার্থনাই করছি যে, এখানে

হিন্দু-মুসলমানরা আবার বন্ধুর ন্যায় পাশাপাশি বাস করুক। আমি জানি এখানের হিন্দুরা অশেষ অত্যাচার ভোগ করেছে এবং এখনও ভোগ করছে। যতদিন না একজন সৎ মুসলমান ও একজন সৎ হিন্দু আশ্রয়প্রার্থীদের নিরাপত্তার ভার গ্রহণ করছে, ততদিন আমি কোনও হিন্দুকে পুনরায় তাদের ঘরে ফিরে যেতে অনুরোধ করব না। এ অঞ্চলে সৎ মুসলমান ও সৎ হিন্দুর নিশ্চয়ই কোন অভাব হবে না এবং তাঁরা হিন্দুদের নিরাপত্তার নিশ্চয়তাও আমাকে দেবেন।

ঐ সভায় স্থানীয় মুসলিম লীগের কয়েকজন সভ্যও উপস্থিত ছিলেন। তাঁরা হিন্দুদের নিরাপত্তা রক্ষার কথা বল্‌লেন। কয়েকজন আশ্রয়প্রার্থী কিন্তু মুসলমানদের ঐ প্রতিশ্রুতিতে বিশ্বাস রাখার অক্ষমতার কথা মহাত্মাকে জানালেন। তাঁরা বল্‌লেন—মুসলমানরা প্রথমে তাঁদের রক্ষা করবে বলেছিল, কিন্তু পরে তারা সে প্রতিজ্ঞা রাখেনি। তাছাড়া গ্রামে তাঁদের ঘরবাড়ী মুসলমানরা পুড়িয়ে দিয়েছে, তাঁরা গিয়ে থাক্‌বেই বা কোথা?

উত্তরে মহাত্মা বল্‌লেন—আবার যাতে আপনাদের ঘর তৈরী হয় এবং বাড়ী ফিরে গিয়ে যাতে আপনারা খাদ্য ও বস্ত্রের অভাবে না পড়েন, গবর্ণমেণ্ট সে দিকে লক্ষ্য রাখবে। পূর্বে যা'ই ঘটে থাক, আজ যদি একজন সৎ মুসলমান ও একজন সৎ হিন্দু আপনাদের নিরাপত্তার ভার নিয়ে গ্রামে ফিরে যাবার জন্য ডাকে তা হ'লে আপনাদের গ্রামে যাওয়া উচিত। কারণ আজ ঐ একজন মুসলমানের পিছনে গ্রামের সকলেরই সমর্থন আছে। সেই জন্যই আপনাদের আমি ফিরে যেতে বলি। এতে আপনারা যদি ফিরে না যান, তা হলে বুঝব, আপনারা ভীরু। একথাও মনে রাখবেন, ঈশ্বর ভীরুর কখনও সহায় নন।

একটি বিধ্বস্ত কুটীর পরিদর্শনে মহাত্মা গান্ধী, মহাত্মার
ডানপাশে শ্রীযুক্তা আভা গান্ধী।

মহাত্মা গান্ধী ১০ই তারিখে চৌমুহানী থেকে দত্তপাড়ায় শিবির স্থানান্তরিত করলেন। সন্ধ্যায় প্রার্থনা সভায় এক বিরাট জনতার সম্মুখে বক্তৃতায় বল্‌লেন—আপনারা পরশ পাথরের নাম শুনেছেন, ভগবানের পবিত্র নামের প্রভাব তদপেক্ষাও অধিক, আপনারা ঈশ্বরকেই কেবল স্মরণ করুন।

সভায় ঐদিন শতকরা ৮০ জন মুসলমান উপস্থিত ছিল, মহাত্মা গান্ধী তাঁদের উদ্দেশ ক'রে বল্‌লেন—আপনারা আজ সত্য করে বলুন, হিন্দুদের পুনরায় বন্ধু বলে গ্রহণ করতে সম্মত আছেন কিনা? যদি আন্তরিকতার সঙ্গে ঐরূপ চা'ন, তবে হিন্দুদের নিরাপত্তার ভার গ্রহণ করুন এবং তাদের স্ত্রী, কন্যা, মাতাকে আপনাদের স্ত্রী, কন্যা, মাতার ন্যায় মনে করুন। আর যদি আপনারা হিন্দুদের বসবাস অসহ্য মনে করেন, তাও স্পষ্ট করে বলুন, তা হ'লে হতভাগ্য আশ্রয়প্রার্থীরা আশ্রয় শিবির ত্যাগ ক'রে অন্যত্র চলে যাক, তবে আমি কিন্তু আপনাদের হৃদয় পরিবর্তন না হওয়া পর্যন্ত এখানেই থেকে যাব, প্রয়োজন হ'লে এইস্থানেই দেহত্যাগ করব।

এর পর মহাত্মা গান্ধী উপরি উপরি ক'দিন ধ'রে নয়াখোলা, সোনাচকা, খিলপাড়া, গোয়াতলী, নন্দীগ্রাম, প্রভৃতি গ্রামগুলো পরিদর্শন করলেন। গ্রামে গ্রামে ঘুরে তিনি স্বচক্ষে ধ্বংসাবশেষ প্রত্যক্ষ করতে লাগলেন এবং দাঙ্গাদুর্গতব্যক্তিদের দুঃখদুর্দশার কাহিনী শ্রবণ করতে লাগলেন। প্রায় একমাস পূর্বে হত্যাকাণ্ড ঘটলেও এই ভ্রমণকালে তিনি বহুস্থানেই মৃতব্যক্তিদের অস্থিপঞ্জর দেখতে পেলেন।

১৩ই নভেম্বর মহাত্মা গান্ধী তাঁর অনুচরদের কাছে এক সিদ্ধান্ত ঘোষণা করলেন। তিনি বল্‌লেন—তাঁর দলের প্রত্যেককেই এমন কি মহিলাদেরও এক একটি উপদ্রুত গ্রামে গিয়ে বাস করতে হবে এবং

সেই সব অঞ্চলের সংখ্যালঘু হিন্দুদের সংরক্ষণ ও নিরাপত্তার জন্য তাঁদেরই দায়ী হ'তে হবে। আর প্রয়োজন হ'লে তাঁদের নিজেদের জীবন দিয়েও হিন্দুদের রক্ষা কর্‌তে হবে।

এই সময়ে উপদ্রুত গ্রামগুলোর অবস্থা অতীব বিপজ্জনক, রক্ত-লোলুপ নরপিশাচরা তখনও অবাধে গ্রামে গ্রামে ঘুরে বেড়াচ্ছে। চুরি, ডাকাতি, শাসানি মোটেই বন্ধ হয়নি। ক'দিন পূর্বে একজন সেবাকর্মীও দুর্বৃত্তদের হাতে নিহত হয়েছেন।

মহাত্মার একজন সহচর তাঁর কাছে উপদ্রুত গ্রাম সমূহে দুর্বৃত্তদের অবাধ দুষ্কার্যের কথা উত্থাপন কর্‌লে এবং তাঁদের একজন সহকর্মীও যে গ্রামে গিয়ে প্রাণ দিয়েছেন একথা বল্‌লে, মহাত্মা বল্‌লেন—এ সমস্তই আমি জানি। এই হত্যাকাণ্ডকে নিবারণ করাই আমাদের কাজ। এই পথ অবলম্বন না কর্‌লে আমার অহিংসা সাধনা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। পূর্ববঙ্গের নারী আজ অসহায় ও নিগৃহীতা। আমার ও আমার সহচরদের আত্মত্যাগে তাঁরা অন্ততঃ সম্মানজনকভাবে মৃত্যু বরণ কর্‌তে শিক্ষা করুক। এতে অত্যাচারীদের চোখ খুলবে এবং হৃদয়ও বিগলিত হবে। এ বিষয়ে আমার কোনও সন্দেহ নাই যে, শেষ পর্যন্ত একদিন অত্যাচারীদের রূপান্তর ঘটবেই।

১৪ই নভেম্বর তারিখে মহাত্মা গান্ধী দত্তপাড়া থেকে ১২ মাইল দূরে রামগঞ্জের নিকটে কাজিরখিল গ্রামে তাঁর হেডকোয়ার্টার স্থানান্তরিত কর্‌লেন। হাঙ্গামার সময়ে এই বাড়ীর গৃহস্বামী ও অপর দুইজনকে হত্যাকরা হয়েছিল। এখানে এসে তিনি পরদিন নন্দনপুর পরিদর্শন কর্‌তে গেলেন। এইদিন রামগঞ্জ বিদ্যালয়ের প্রাঙ্গনে মহাত্মা গান্ধীর প্রার্থনা সভার অনুষ্ঠান হ'ল। প্রার্থনা সভায় তিনি বল্‌লেন—পূর্ববঙ্গে মুসলমানরাই আক্রমণকারী ; হিন্দুরা তাঁদের ভয়ে ভীত। মানুষ

ভগবানের স্বরূপ নিয়েই জন্মগ্রহণ করেছেন, মন্দ কাজের পরিবর্তে সৎ কাজ করলেই তবে তাঁর এই ঐশ্বরিক উত্তরাধিকারের সার্থকতা। ইসলাম ধর্মে বলপূর্ব্বক ধর্মান্তরিত করণ ও নারী নিগ্রহ কখনও সমর্থন করে না। আর হৃদয়ে গ্রহণ না ক'রে, মুখে শুধু কলমা আবৃত্তি কর্‌লেই ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করা হয় না!

১৬ই তারিখে মহাত্মা করপাড়া পরিদর্শনে গেলেন। ঐ দিন সন্ধ্যায় অসামরিক সরবরাহ বিভাগের মন্ত্রী মিঃ গফরান ও কৃষিমন্ত্রী মিঃ আহমদ হুসেন কয়েকজন পার্লামেণ্টারী সেক্রেটারী ও স্থানীয় জনকতক লীগ কর্মীকে নিয়ে মহাত্মার সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন এবং গবর্ণমেণ্টের পুনর্বসতির নীতি নিয়ে মহাত্মার সঙ্গে আলোচনা করলেন। ঐ দিন ১৬ই তারিখে মহাত্মার প্রার্থনা সভায় মিঃ গফরানও বক্তৃতা করলেন। গফরান সাহেব তাঁর বক্তৃতায় পূর্ব্ববঙ্গের ঘটনার জন্য দুঃখ প্রকাশ করলেন এবং তিনি মুসলমানদের পক্ষ থেকে হিন্দুদের পুনরায় নিজ নিজ গৃহে ফিরে যাবার জন্য অনুরোধ জানালেন। তিনি বল্‌লেন—হিন্দু-মুসলমান এতকাল বন্ধুর ন্যায় পাশাপাশি বাস করে আস্‌ছে, এখনই বা তাদের মধ্যে শত্রুতা থাকবে কেন?

মিঃ গফরানের বক্তৃতার পরে মহাত্মা গান্ধী তাঁর ভাষণে শ্রোতাদের বল্‌লেন—আপনারা গফরান সাহেবের বক্তৃতা শুন্‌লেন। তাঁর বক্তৃতা শুনে আপনারা বুঝতে পারছেন যে, মন্ত্রীরা চাহেন—হিন্দু-মুসলমান পূর্ব্বের ন্যায় বন্ধুভাবেই বসবাস করুক। এখানে যা ঘটে গেছে তা অত্যন্ত মর্মন্তুদ। তাহ'লেও আপনারা সকল ভয় ও অবিশ্বাস দূর ক'রে পুনরায় নূতন ক'রে জীবনযাত্রা সুরু করুন।

১৭ই নভেম্বর প্রাতে মহাত্মা গান্ধী কাজিরখিল থেকে প্রায় দু মাইল দূরে অবস্থিত দশঘরিয়া গ্রাম পরিদর্শন কর্‌লেন। কয়েকজন

স্ত্রীলোক ঐ দিন মহাত্মার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। দাঙ্গার সময় তাঁদের বলপূর্বক ধর্মান্তরিত করা হয়েছিল। পরে আবার তাঁরা স্বধর্মে ফিরে আসেন।

এই দিন কাজিরখিলের এক মাইল দূরে মধুপুর হাইস্কুলের খেলার মাঠে মহাত্মার প্রার্থনা সভার অনুষ্ঠান হ'ল। মহাত্মা ধান ক্ষেতের আঁকা-বাঁকা পথের উপর দিয়ে প্রার্থনা সভায় গেলেন। এই দিনের প্রার্থনা সভায় বহু আশ্রয়প্রার্থী যোগদান করে। অনেক মুসলমানও সভায় উপস্থিত ছিল। সরবরাহ সচিব মিঃ গফরানও এই দিনের প্রার্থনায় বক্তৃতা করেছিলেন।

১৮ই নভেম্বর সোমবার মহাত্মার মৌন দিবস থাকায় প্রার্থনা সভায় তাঁর লিখিত অভিভাষণ পাঠ করা হয়। তিনি বললেন—আমি এখানে যতই ঘুরছি ততই বুঝতে পারছি যে, ভয়ই আমাদের সর্বাপেক্ষা বড় শত্রু। যে ব্যক্তি মন থেকে ভয় বিসর্জন দিয়েছে, কেহই তাকে অত্যাচারের ভয় দেখাতে পারে না। ঈশ্বর নির্ভীকের সহায়। আমরা একমাত্র তাঁকেই ভয় করব এবং তাঁরই শরণ নেব। তা হ'লে অন্যান্য সকল ভয় দূরীভূত হবে।

১৯শে নভেম্বর আশ্রয়প্রার্থীদের একটি কেন্দ্রে প্রার্থনা সভা বসল। মহাত্মাজী একটি প্রশ্নের উত্তরে বললেন—নারী-পুরুষ উভয়কেই সাহসী হ'তে হবে। ভীরু পুরুষ বা নারী ধর্মের বোঝাস্বরূপ। তারা আজ মুসলমান হয়েছে, কাল খৃষ্টান হবে, আবার অন্য দিন অপর ধর্ম গ্রহণ করবে, তারা মনুষ্যপদবাচ্যই নয়। সাহসী না হ'লে তাদের মরণই শ্রেয়, এই কথাই ঘোষণা করতে আমি এখানে এসেছি।

এই সময়ে প্রায় ২০ দিন যাবৎ মহাত্মাজী সামান্য নেবুর রস ও ডাবের জল মাত্র পান করতেন। বিহারে হিন্দুরা সেখানকার মুসলমানদের

উপর নোয়াখালির প্রতিশোধ নিতে সুরু করলে, মহাত্মা গান্ধী সেই হাঙ্গামা বন্ধ করবার জন্য প্রথমে তিনি অনশনের সঙ্কল্প করেছিলেন। তবে অবিলম্বে দাঙ্গা বন্ধ হওয়ায় তিনি সে সঙ্কল্প ত্যাগ ক'রে এই সামান্য মাত্র আহার গ্রহণ করছিলেন। ডাঃ রাজেন্দ্র প্রসাদের নিকট থেকে বিহারের হাঙ্গামা বন্ধের সঠিক সংবাদ পেয়ে ১৯শে নভেম্বর থেকে তিনি তাঁর স্বাভাবিক আহার গ্রহণ করেন।

মহাত্মা গান্ধী তাঁর অহিংসার কর্মপদ্ধতি পরীক্ষা করবার জন্য ২০শে নভেম্বর বেলা ১১টার সময় তাঁর সঙ্গীদের কাজিরখিলে রেখে সেখান থেকে ৪ মাইল পশ্চিমে শ্রীরামপুর নামক একটি গ্রামে অবস্থান করার জন্য একা রওনা হলেন। শুধুমাত্র সঙ্গে নিলেন, তাঁর স্টেনোগ্রাফার পরশুরাম ও দোভাষী অধ্যাপক নির্মলকুমার বসুকে। ৭৮ বৎসর বয়সে পরিণত বার্ধক্যে তিনি একা চল্‌লেন কঠোর সাধনায়। দুই সম্প্রদায়ের বিরোধের অবসান ঘটাবার জন্য এই যে তাঁর সাধনা—এতে হয় তিনি কৃতকার্য হবেন, নতুবা মৃত্যু বরণ করবেন, এই হ'ল তাঁর সঙ্কল্প। এই সময়ে প্রায় ২০ দিন ধ'রে তিনি অতি অল্প মাত্র আহার গ্রহণ করায় শরীরের ওজন তাঁর অনেক কমে গিয়েছিল, তিনি অনেকটা দুর্বল হ'য়ে পড়েছিলেন। গ্রামে গ্রামে ঘুরে ঠাণ্ডায় সর্দি দেখা দেয়। গায়ে ছোট ছোট গুটিকাও হয়। কিন্তু এ সমস্ত কিছুই তিনি ভ্রূক্ষেপ করলেন না। মৃত্যুপণ ক'রে কর্তব্য সাধনের জন্য একাই রওনা হলেন। আশ্রমবাসীদের নিকট থেকে তাঁর এই বিদায় গ্রহণ এক মর্মস্পর্শী দৃশ্য হয়ে উঠল। বিদায়কালে একমাত্র মহাত্মা গান্ধী ব্যতীত সকলেরই চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হ'ল। মহাত্মা নৌকায় ক'রে কাজিরখিল থেকে শ্রীরামপুরের পথে যাত্রা করলেন। মহাত্মার নৌকাখানা যতক্ষণ পর্যন্ত দেখা যাচ্ছিল, আশ্রমবাসীরা তীর থেকে বাষ্পাকুল নেত্রে শুধু সেই দিকেই চেয়ে

রইল। পরে মহাত্মারই নির্দেশক্রমে তাঁরাও একজন দু'জন ক'রে এক একটা উপদ্রুত গ্রামে ছড়িয়ে পড়ল।

মহাত্মা গান্ধীর এই শ্রীরামপুর অভিযানকে জনৈক সাংবাদিক বার্ধক্যে টলষ্টয়ের শেষ যাত্রার সঙ্গে তুলনা করেন। এক ভয়ঙ্কর ঝড়ের মধ্যে মহামতি টলষ্টয় যাত্রা করেছিলেন, কিন্তু তিনি আর ফেরেন নাই। মহাত্মা গান্ধীও তেমনি এক মহা রাজনৈতিক দুর্যোগের মধ্যে বেরুলেন।

প্রসিদ্ধ ডাণ্ডী অভিযান কালে তিনি যেমন একগাছি বাঁশের লাঠি মাত্র সঙ্গে নিয়েছিলেন, এবারেও সঙ্গীহীন অবস্থায় গ্রামাঞ্চলে ভ্রমণের সময় ভরদিয়ে হাঁটবার জন্য একটি বাঁশের লাঠি নিলেন।

মহাত্মা তাঁর শ্রীরামপুর অভিযান সম্বন্ধে সংবাদপত্রে এই সময়ে এক বিবৃতি দিলেন। বিবৃতিতে তিনি বল্লেন—

আমি চারিদিকে কেবল মিথ্যা ও অতিরঞ্জিত ঘটনাই শুন্‌ছি। এর মধ্য থেকে ঠিক সত্য বার করতে পারছি না। হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে বহুকালের বন্ধুত্ব আজ ভেঙ্গে গেছে, তাঁরা পরস্পর ভয়ঙ্কর অবিশ্বাসী হয়ে উঠেছে। আমি দৃঢ়ভাবে বরাবরই একথা বলে থাকি যে, আমি সত্য ও অহিংসায় বিশ্বাসী। এই বিশ্বাসই গত ৬০ বছর ধরে আমাকে বাঁচিয়ে রেখেছে।

আজ সেই সত্য ও অহিংসার মধ্য দিয়ে নিজেকে পুনরায় পরীক্ষা করার জন্য, এতকাল যাঁরা আমার জীবনযাত্রাকে সহজ করে রেখেছিল, তাঁদের সঙ্গ হতে নিজেকে বিছিন্ন করে, আমি শ্রীরামপুর নামে একটা গ্রামে চলেছি। সেখানে গিয়ে আমি গ্রামের ভিতরে মুসলমানদের সঙ্গে যতটা পারি যোগ স্থাপনের চেষ্টা করব। লীগ মন্ত্রীদের আমি অনুরোধ করব, যেন তাঁরা প্রত্যেক উপদ্রুত গ্রামের জন্য আমাকে একজন ক'রে

সৎ ও সাহসী মুসলমান দেন। সেই সৎ মুসলমান, তাঁর সঙ্গে এইরূপ আর একজন সৎ ও সাহসী হিন্দুকে নিয়ে গ্রামে যাবেন এবং তাঁরা আশ্রয়প্রার্থী শিবির থেকে হিন্দুদের গ্রামে ফিরিয়ে আনবেন। প্রয়োজন হ'লে তাঁরা নিজেদের জীবন দিয়েও উৎপীড়িত হিন্দুদের রক্ষা করবেন। দুঃখের সঙ্গে জানাতে বাধ্য হচ্ছি যে এরকম ব্যবস্থা না হ'লে হিন্দুদের আশ্রয় প্রার্থী শিবির থেকে ফিরিয়ে আনা কঠিন হবে।

নোয়াখালী এবং ত্রিপুরার হাঙ্গামার যে সকল বিবরণ আমি পেয়েছি তাতে মনে হয়, গ্রামে হিন্দুদের জীবন এখনও নিরাপদ নয়। সেইজন্যই তাঁরা নিজেদের ঘর বাড়ী, চাষ আবাদ সমস্তই ছেড়ে গবর্ণমেণ্টের দেওয়া, কি অন্য কারও দেওয়া যৎসামান্য খাদ্য সামগ্রীতেও বেঁচে থাকাকে ভাল বলেই মনে করেছে।

আমি শ্রীরামপুরে গিয়ে চিঠিলেখা, হরিজনের কাজ প্রভৃতি অন্যান্য কাজও বন্ধ রাখব স্থির করেছি। এই অনিশ্চিত অবস্থায় আমার কতদিন কাটবে তার কোন স্থিরতা নেই। তবে এই পর্যন্ত বলতে পারি যে, হিন্দু-মুসলমান পরস্পরের মধ্যে যতদিন না বিশ্বাস ফিরে আসে এবং গ্রামে তাদের পুনরায় সহজ জীবন যাত্রা সুরু হয়, ততদিন আমি পূর্ববঙ্গ ছাড়ছি না।

শ্রীরামপুরে এসে মহাত্মা গান্ধী চারদিকে ধানক্ষেতের মধ্যে অবস্থিত একটি ছোট্ট টিনের ঘরে অবস্থান ক'রতে লাগলেন। বাজার, পোস্ট অফিস প্রভৃতি সেখান থেকে অনেক দূরে ছিল। মহাত্মা গান্ধী পুত্র কন্যার ন্যায় প্রিয় আশ্রমবাসীদের ত্যাগ করে শ্রীরামপুরে এসে প্রথম দিন বড় অসুবিধা ভোগ করলেন। তাঁর আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি যথাসময়ে তিনি ঠিক মত পাচ্ছিলেন না। এখানে রান্না, বিছানা প্রভৃতি সকল কাজই তাঁকে নিজেকে ক'রে নিতে হ'ল। যদিও অধ্যাপক নির্মলকুমার

বসু ও পরশুরাম তাঁর সঙ্গে ছিলেন তা হ'লেও মহাত্মা তাঁদের উপর অন্য কাজের ভার দিয়ে রেখেছিলেন।

শ্রীরামপুর গ্রামে ১৪ শত মুসলমানের বাস। হিন্দু যারা এই গ্রামে বাস করত, তারা মুসলমানদের তুলনায় সংখ্যায় অতি নগন্য ছিল। মহাত্মা গান্ধী এখানে এসেই স্থানীয় ব্যক্তিদের সঙ্গে আলাপ আলোচনায় প্রবৃত্ত হলেন। তিনি মুসলমানদের বাড়ীতে বাড়ীতে ভ্রমণ ক'রে দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে পরস্পর সহযোগিতা ও সহনশীলতার জন্য বাণী প্রচার করতে লাগলেন। এইভাবে মানবতার আবেদন নিয়ে বাড়া বাড়ী ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। স্থানীয় মুসলমানরা অনেকেই মহাত্মাকে আমন্ত্রণ করে নিজেদের বাড়ীতে নিয়ে যেতে লাগল এবং তাঁর কাছে নিজেদের দুঃখ কষ্টের কাহিনী বর্ণনা ক'রতে লাগল। মহাত্মা শান্তির বাণী প্রচার করতে থাকলেও সঙ্গে সঙ্গে গ্রামবাসীদের অবস্থার উন্নতিরও চেষ্টা করতে লাগলেন। তিনি স্থানীয় লোকদের বাড়ীতে গিয়ে তাদের অবস্থার কথা জিজ্ঞাসা করলে, তারাও নিজেদের দুঃখের কথা মহাত্মার কাছে বলতে থাকল। মুসলমানরা মহাত্মাকে নিজেদের বিশেষ বন্ধু বলে গ্রহণ করল। তিনি রুগ্ন ও দুর্গত মুসলমানদেরও পাশে গিয়ে দাঁড়ালেন।

শ্রীরামপুর ও পার্শ্ববর্তী গ্রাম থেকে রোগীর দল মহাত্মার কাছে ওষুধ চাইতে আসতে লাগল। তিনি তাঁর শিষ্যা ডাঃ সুশীলা নায়ারকে শ্রীরামপুর ও পার্শ্ববর্তী গ্রামগুলোর রোগীদের পরিচর্যার ভার দিলেন। ডাঃ নায়ার এই সময়ে চাঙ্গিরগাঁও গ্রামে মহাত্মার নির্দেশ অনুযায়ী শান্তি স্থাপনের কাজে ব্যাপৃত ছিলেন। তিনি ১০।১২ মাইল পর্যন্ত হেঁটে হেঁটে রোগী দেখ্‌তে যেতে লাগলেন। মহাত্মা নিজেও প্রায়ই তাঁর রোগীদের সঙ্গে অন্তরঙ্গের ন্যায় কথা বলতেন। তার উপস্থিতি ও পরিহাস

মহাত্মাজী নোয়াখালির একটি গ্রাম্য সেতু অতিক্রম করছেন।

রসিকতায় পীড়িত ব্যক্তিরাও মনে যথেষ্ট আনন্দ অনুভব করত। মহাত্মার উপদেশে গ্রামবাসীরা পানীয় জলের অভাব দূর করার জন্য নলকূপ খননের আয়োজন করল।

গ্রামের পথ সাধারণত কোথাও সুগম নয়। মহাত্মা গান্ধী সেই দুর্গম পথেই ঘুরে ঘুরে মুসলমানদের বাড়ীতে যেতে লাগলেন। একদিন এক মুসলমানের বাড়ী থেকে ফেরবার কালে বৃষ্টি হওয়ায় পথ ভীষণ পিচ্ছিল হয়ে গেল। মহাত্মা লাঠিতে ভর দিয়ে আধ মাইলেরও বেশী সেই পিচ্ছিল পথ অতিক্রম ক'রে তাঁর কুটীরে ফিরে এলেন। গ্রামে নদী নালা থাকায় বহুস্থানেই সামান্য বাঁশ কি কাঠ বেঁধে পুল করা হয়ে থাকে। এই সব পুল পার হওয়া যেমন কষ্টকর তেমনি বিপজ্জনক। একটু অসাবধান হ'লেই জলে প'ড়ে যাওয়ার বেশী রকম সম্ভাবনা। গ্রামে ভ্রমণ-কালে মহাত্মাকে এই সকল পুলও অতিক্রম করতে হ'ল।

২২শে নভেম্বর রামগঞ্জ ডা৹ক বাংলোয় মহাত্মা গান্ধীর উপস্থিতিতে হিন্দু ও মুসলমান সমাজের বিশিষ্ট নেতাদের নিয়ে এক সভা হ'ল। সভায় দুই সম্প্রদায়ের সমান সংখ্যক ব্যক্তি নিয়ে প্রতি ইউনিয়নে শান্তি কমিটি গঠিত হ'ল। উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে পরস্পর ভ্রাতৃভাব পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করা এবং যে সকল হিন্দু ঘর ছেড়ে চলে গেছে, তাদের পুনরায় ফিরিয়ে আনাই হ'ল এই সব শান্তি কমিটির প্রধান কাজ।

রামগঞ্জ থেকে নৌকায় ক'রে দুমাইল গিয়ে মহাত্মা গান্ধী চণ্ডীপুরে তাঁর প্রার্থনা সভায় আশ্রয়প্রার্থীদের বললেন—শান্তি কমিটি স্থাপিত হয়েছে, আশ্রয়প্রার্থীদের এবার গ্রামে ফিরে যাওয়া উচিত এবং কারও কিছু বক্তব্য থাকলে উক্ত কমিটিকে তা জানান আবশ্যক।

নৌকাযোগে চণ্ডীপুর যাওয়ার পথে মহাত্মার কয়েকবার ভেদবমী হ'ল, কিন্তু তিনি তা মোটেই গ্রাহ্য করলেন না। তিনি কর্তব্যবোধেই

চণ্ডীপুরে গেলেন এবং শীতের রাত্রে দ্বিপ্রহরের সময় সেখান থেকে শ্রীরামপুর কুটীরে ফিরে এলেন।

২৪শে নভেম্বর তারিখে শ্রীশরৎচন্দ্র বসু মহাত্মাজীর কুটীরে গিয়ে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করলে, মহাত্মা গান্ধী তাঁকে বললেন—বাঙ্গলা দেশে সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে আমাকে যদি একাই সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হয়, তবুও আমি চালিয়ে যায়। আবশ্যক হলে পূর্ববঙ্গে আমি দেহরক্ষা করব।

মহাত্মা গান্ধী পূর্বে বাঙ্গলা জানতেন না। স্থানীয় লোকের সঙ্গে কথাবার্তা ব'লতে অসুবিধা হওয়ায় তিনি তাঁর দোভাষী অধ্যাপক নির্মলকুমার বসুর কাছ থেকে বাঙ্গলা ভাষা শিক্ষা করতে থাকলেন। তিনি প্রতিদিনই কিছু কিছু ক'রে বাঙ্গলা লেখা ও পড়া অভ্যাস করতে লাগলেন। এমন কি তিনি পূর্ব-বাঙ্গলার কথ্য ভাষাও শিক্ষা করতে চেষ্টা করলেন। মহাত্মাজী এই সময় বলতেন—আমি এখন বাঙ্গালী, নোয়াখালিবাসী।

একজন ৭৮ বৎসরের বৃদ্ধ অসীম ধৈর্যের সঙ্গে অল্প সময়ের মধ্যে একটা সম্পূর্ণ নূতন ভাষা শিখে, নগণ্য গ্রামসমূহের দুর্গম পথে ঘুরে ঘুরে গ্রামবাসীদের সঙ্গে সেই ভাষায় কথা ব'লে তাদের দুঃখের কথা শুনতে লাগলেন, এবং নিজের সকল কাজকর্ম ভুলে, শত প্রতিকূল অবস্থা থাকা সত্ত্বেও দুর্গতদের দুঃখ মোচনের জন্য নিজের জীবন পণ করলেন। কথাটা শুনলে রূপকথা বলেই মনে হয়, এ শুধু একমাত্র মহামানব মহাত্মা গান্ধীর পক্ষেই সম্ভব ছিল।

মহাত্মা গান্ধীর প্রার্থনা সভায় প্রতিদিনই হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়েরই বহু লোক উপস্থিত থাকত। তিনি প্রায় প্রতিদিনই পরস্পরকে বিশ্বাস করতে উপদেশ দিতেন এবং ভগবান ভিন্ন অপর কা'কেও ভয় করতে নিষেধ করতেন। তিনি দুর্গতদের ঐকান্তিক-

ভাবে ভগবানের নাম স্মরণ করতে বলতেন। মুসলমান শ্রোতাদের মাঝে মাঝে তিনি কোরাণের উপদেশ ও হজরৎ মহম্মদের কথা শোনাতেন। ১১ই ডিসেম্বর প্রার্থনা সভায় তিনি বল্লেন—হিন্দু-মুসলমানের সম্পর্ক রক্তের সম্পর্কের মত। একই জমির উৎপন্ন খাদ্যে উভয়ের দেহ পুষ্ট হয়। একই নদীর জল পান ক'রে দুজনেই তৃষ্ণা দূর করে এবং একই মাটিতে তারা শেষ শয্যা গ্রহণ করে।

তারপর মহাত্মা বল্লেন—পৃথিবীতে বহু ধর্মমত থাকলেও প্রত্যেক ধর্মেই আধ্যাত্মিক অনেক কথা রয়েছে। এই সব আধ্যাত্মিক কথাগুলো প্রায় সকল ধর্মেই অভিন্ন। এই দিক দিয়ে এক ধর্মের সঙ্গে অপর ধর্মের সৌসাদৃশ্য লক্ষ্য করবার বিষয়। তবে বর্তমানে প্রত্যেক ধর্মেই অনেক দোষ জুটেছে। সেগুলো ঐসকল ধর্মের মূল শিক্ষার বিরোধী।

১৮ই ডিসেম্বর সান্ধ্যপ্রার্থনার পর মহাত্মা গান্ধী সংবাদ পত্র সমূহের সংবাদ সরবরাহের কথা উত্থাপন করলেন। তিনি বললেন—কতকগুলো সংবাদপত্র বিক্রয় বৃদ্ধির দিকে দৃষ্টি রেখে সংবাদ হয় অতিরঞ্জিত করছে, না হয় সংবাদ কমিয়ে দিচ্ছে। কিন্তু সত্যকে ত আর গোপন করা বা অতিক্রম করা যায় না। সত্য সূর্য অপেক্ষাও ভাস্বর। একদিন তার প্রকাশ হবেই। আমাদের কাজ যতই ছোট হ'ক না কেন, তা যদি সত্যমূলক হয়, তবে তার জন্য কখনও অনুতাপ করতে হবে না। সত্যের ফল ফলবেই এবং সত্যই আমাদের রক্ষা করবে।

মহাত্মা গান্ধী শ্রীরামপুরের শান্ত পরিবেশের মধ্যে অবস্থান ক'রে ক্রমশ স্থানীয় হিন্দু-মুসলমানদের হৃদয় জয় করতে সমর্থ হ'লেন। উভয় সম্প্রদায়ই তাঁকে তাঁদের বন্ধু বলে গ্রহণ করলেন। এখানে থেকে তিনি তাঁদের বন্ধু, উপদেষ্টা ও চিকিৎসক হয়ে পড়লেন।

মহাত্মাজীকে দেশের প্রতিদিনের সংবাদ জানাবার জন্য কাজিরখিল শিবিরে একটি বেতার-যন্ত্র স্থাপন করা হয়। এই শিবিরটি খাদি প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র দাসগুপ্তের পরিচালনাধীনে থাকে। প্রত্যহ প্রাতে ও অপরাহ্ণে বেতার যন্ত্র হ'তে সংগৃহীত সংবাদ সমূহ লিপিবদ্ধ ক'রে বিশেষ প্রতিনিধি দ্বারা মহাত্মাজীর নিকটে প্রেরণের ব্যবস্থা হয়। খাদি প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে নোয়াখালি শান্তি মিশন ও রিলিফ নামে এখানে একটি বিভাগ খোলা হয়। এই বিভাগ একটি দাতব্য চিকিৎসালয় পরিচালনা করে। গঠনমূলক পরিকল্পনা অনুযায়ী এই কেন্দ্রে বুনিয়াদি শিক্ষার ব্যবস্থাও চলে।

শ্রীরামপুরে দিনের পর দিন মহাত্মার সাক্ষাৎকারীর সংখ্যা বাড়তে থাকে এবং তাঁর চিঠির সংখ্যাও ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে থাকে। তাঁর বেশীর ভাগ সময় সাক্ষাৎকরা ও চিঠিপত্র লেখাতেই কেটে যেত। ২০শে ডিসেম্বর বিকালে একজন ফরাসী সাংবাদিক মঃ রেমণ্ড কার্টিয়ার যখন মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে যান, তখন তিনি কাদা মেখে প্রাকৃতিক চিকিৎসায় রত ছিলেন। তিনি বহুক্ষণ ধ'রে মহাত্মাজীর সঙ্গে ইউরোপের অবস্থা সম্পর্কে আলোচনা করলেন। মহাত্মা গান্ধী তাঁকে বললেন—ইউরোপ আজ মুখে শান্তির কথা বলছে বটে, কিন্তু অন্তরে যুদ্ধেরই কামনা করছে। তারা অন্তর হ'তে হিংস্রভাব দূর না করলে শান্তি প্রতিষ্ঠা অসম্ভব। বর্তমানে ইউরোপ যেভাবে চলছে, তার পরিবর্তন না হলে ধ্বংস অনিবার্য। ইউরোপে হিটলারবাদ অধিকতর ক্ষমতাশালী হিটলারবাদ দ্বারা পরাজিত হয়েছে। আবার আরও এক শক্তিশালী হিটলারবাদ একেও পরাজিত করবে; এইভাবেই চলতে থাকবে।

২০শে ডিসেম্বর মহাত্মা গান্ধী প্রার্থনা সভায় বললেন—আজ আমি যে সমস্যার সম্মুখীন হয়েছি, জীবনে কখনও এরূপ সমস্যার সম্মুখীন হই নি।

আজ আমার অহিংসার যাচাই হচ্ছে। আমাদের প্রত্যেক কাজ অহিংসা ও সত্যের দ্বারা প্রভাবিত হওয়া আবশ্যক।

২১শে ডিসেম্বর মহাত্মা গান্ধীর প্রার্থনা সভার কিছু পূর্বে কয়েক ব্যক্তি দুর্গতদের সাহায্য ও পুনর্বসতির বিষয় নিয়ে তাঁর সঙ্গে আলোচনা করতে আসেন। তিনি তাঁদের যা বলছিলেন, তা অপরের পক্ষেও শুনবার মত ব'লে, প্রার্থনা সভায় তার পুনরুত্থাপন করলেন। তিনি বললেন—অপরের দান গ্রহণ করা যেমন অন্যায়, কাকেও কিছু দান করাও ঠিক তেমনি অন্যায়। আমাদের দেশে ধর্মের নামে অনেকেই অধর্ম করছে। শুনতে পাওয়া যায়, ভারতে ৫৬ লক্ষ সন্ন্যাসী ভিক্ষাজীবী হয়ে বাস করে। এর মধ্যে অধিকাংশকেই মোটেই যোগ্যতাসম্পন্ন বলা চলে না। এই হতভাগ্য দেশে এমন কি অস্পৃশ্যতাকেও ধর্মের দোহাই দিয়ে চালান হ'য়ে থাকে। আজ নোয়াখালিতে যে অবস্থা হয়েছে, তাতে সারা ভারতবর্ষ হ'তে অনেকেই দান করতে উৎসাহী হয়েছেন। এতে দুইটি বিপদের সম্ভাবনা রয়েছে। প্রথমত দুর্গতদের অনেকেই হয়ত ইচ্ছাপূর্বক এদের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকবে, অপর দিকে দাতারা দান ক'রে পুণ্য অর্জনে আত্মপ্রসাদের চেষ্টায় থাকবে, এই উভয় পথই বন্ধ করা দরকার। লোকে নিঃস্ব হয়ে আশ্রয়কেন্দ্রে এসে যে জড়ো হয়েছে, এতে তাদের কোনও দোষ নেই। তারা যাতে ফিরে গিয়ে শান্তিতে বাস করতে পারে, তজ্জন্য সাধারণ দাতব্য প্রতিষ্ঠানগুলো অপেক্ষা গবর্ণমেন্টেরই এ বিষয়ে অগ্রণী হওয়া কর্তব্য এবং তাঁদের সেবাকার্য চালিয়া যাওয়া উচিত। এখানে যে সকল প্রতিষ্ঠান কাজ করছে তাদের জানিয়ে দেওয়া উচিত যে, শ্রম না ক'রে কারও একবেলাও আহার গ্রহণ করা অসম্মানজনক। এদের শ্রমবিমুখতা দূর ক'রে আত্মনির্ভরতা শেখাতে হবে, তা হলে আমাদের জাতীয় চরিত্রও

উন্নত হবে। আর আশ্রয়প্রার্থীদের এমন কি গবর্ণমেণ্টের নিকটেও সাহায্য গ্রহণের সময় বলতে হবে যে, আজ তারা ধনী দরিদ্র নির্বিশেষে নিঃস্ব। জীবনধারণের জন্য আজ তাদের খাদ্য, বস্ত্র, আশ্রয় ও ঔষধের প্রয়োজন। তবে তারা নিজ নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী কাজের বিনিময়ে গবর্ণমেণ্টের নিকট হতে তা গ্রহণ করবে, নচেৎ উহা জাতীয় সম্পদ চুরি ব'লে গণ্য হবে।

২২শে ডিসেম্বর শ্রীরামপুরের প্রায় ৮ মাইল দূরে পানিয়ালা গ্রামে একটি সার্বজনীন ভোজের ব্যবস্থা হয়। এর মুখ্য উদ্দেশ্য অস্পৃশ্যতা দূরীকরণ। এখানের এক জরুরী সভায় মহাত্মা গান্ধীর যাওয়ার কথা ছিল, কিন্তু পথ অত্যন্ত খারাপ হওয়ায় তিনি যেতে পারলেন না। তিনি তাঁর এক প্রেরিত বাণীতে এই আশা প্রকাশ করলেন যে, পানিয়ালা এবং তার পার্শ্ববর্তী গ্রামগুলো অস্পৃশ্যতা বর্জন করবে এবং সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের ভাইদের শান্তিতে বসবাস করবার ব্যবস্থা করে দেবে। এই সময়ে ছুঁৎমার্গ দূর করবার জন্য চণ্ডীপুরেও একটি সার্বজনীন ভোজ হয়। এই দেখাদেখি বাঙ্গলার সর্বত্রই ঐক্যত্রিক ভোজনের এক হিড়িক পড়ে যায়।

২৩শে ডিসেম্বর প্রার্থনা সভায় অনেকেই মহাত্মাজীকে জিজ্ঞাসা করেন যে, তিনি বাঙ্গলা সরকারের বিরুদ্ধে অনশন করছেন না কেন। এর উত্তরে মহাত্মাজী বললেন—এরূপ করলে বাঙ্গলার মন্ত্রীসভাকে হেয় প্রতিপন্ন করা হবে। লীগ মন্ত্রীসভাকে হেয় করবার জন্য আমি এখানে আসি নি। অধিকাংশ মন্ত্রীই আমার বন্ধুস্থানীয়। গত অক্টোবর মাসে এখানে যে শান্তি নষ্ট হয়েছে, সেই শান্তি পুনরায় ফিরিয়ে আনাই আমার উদ্দেশ্য। সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হলেই সন্তুষ্টচিত্তে নোয়াখালি ত্যাগ করব।

নোয়াখালি হ'তে তিনি একটি সত্যাগ্রহ আন্দোলন চালাবেন, এইরূপ এক গুজবের প্রতিবাদ ক'রে তিনি বললেন—সত্যাগ্রহী সর্বদাই তাঁর বিরুদ্ধ দলের নিকটে নিজের পরিকল্পনা প্রকাশ করবেন। গোপনীয়তা অবলম্বন করলে তা সত্যাগ্রহ হ'বে না। তিনি আরও বললেন—অন্যত্র আমার যথেষ্ট কাজ রয়েছে। বর্তমানে দেশে যে রাজনৈতিক জটিলতার সৃষ্টি হয়েছে, তাতে দিল্লীতে উপস্থিতি আমার একান্ত প্রয়োজনীয় ছিল। তবে এখানেও আমি যে ব্রত গ্রহণ করেছি তারও গুরুত্ব কম নয়। এখানে সফলকাম হ'তে পারলে সর্বত্রই এর প্রভাব দেখা দেবে।

২৪শে তারিখে প্রার্থনা সভার পূর্বে পার্শ্ববর্তী গ্রাম হ'তে একটি বৃহৎ কীর্তনিয়ার দল আসে। এইদিন প্রার্থনা সভায় বহু মহিলা উপস্থিত ছিলেন। মহাত্মাজী প্রার্থনা সভায় প্রবেশ করলে, তাঁরা উলুধ্বনি দিয়ে তাঁকে বরণ করলেন। মহাত্মা প্রার্থনার পর আশ্রয়প্রার্থীদের উপদেশ দিয়ে বললেন—যারা নিজেদের গৃহে ফিরতে ইচ্ছুক তাদের ভগবানের উপর এবং আত্মশক্তির উপরে বিশ্বাস করতে হবে, সর্বদাই সেবাপ্রতিষ্ঠানগুলোর মুখাপেক্ষী হয়ে থাকা উচিত নয়। দুঃখ কষ্ট হলেও এবার আশ্রয়-প্রার্থীদের নিজ নিজ বাড়ীতে ফিরে যাওয়া উচিত।

২৫শে ডিসেম্বর যীশুর জন্মদিবস ব'লে ঐদিন মহাত্মাজীর প্রার্থনা সভায় বাইবেল পাঠ একটি বিশেষ অঙ্গ ছিল। মহাত্মা শ্রোতাদের বললেন যে, তিনি পূর্বে বিভিন্ন ধর্ম মতে সহিষ্ণুতা বিশ্বাস করতেন, কিন্তু এখন তিনি সকল ধর্মের সমতা ও অভিন্নতায় বিশ্বাস করেন। তিনি আরও বললেন যে, অনেকেই যীশুকে খৃষ্টান সম্প্রদায়ের ব'লে মনে করেন, কিন্তু তাঁর শিক্ষা ও বাণী হ'তে দেখা যায়, তিনি প্রকৃতপক্ষে কোন সম্প্রদায় বিশেষের ছিলেন না।

এই দিন শ্রীযুক্তা সুচেতা কৃপালনী মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। শ্রীযুক্তা কৃপালনী ও তাঁর কয়েকজন সহকর্মী দত্তপাড়ায় একটি সান্ধ্য-বিদ্যালয় খোলেন। গ্রামের মেয়েদের ঐখানে লেখাপড়া শেখানর ব্যবস্থা হয়। সুতা কাটা, সেলাই ও অন্যান্য কুটীরশিল্পেরও প্রবর্তন করা হয়। শ্রীযুক্তা কৃপালনী মহাত্মার আদর্শ অনুযায়ী বিভিন্ন গ্রামে ১৮টি কেন্দ্রে কয়েকজন সহকর্মীসহ গ্রাম পুনর্গঠনের কাজে নিযুক্ত থাকেন।

ভারত সম্পর্কে বৃটিশ গবর্ণমেন্টের ৬ই ডিসেম্বরের বিবৃতি ও তৎপরবর্তীকালে পার্লামেন্টে ভারতসচিবের বক্তৃতায় যে সমস্যার উদ্ভব হয়, মহাত্মাজীর সঙ্গে তা নিয়ে আলোচনার জন্য ২৭শে মধ্যরাত্রিতে পণ্ডিত নেহরু, আচার্য কৃপালনী, শঙ্কররাও দেও ও কুমারী মৃদুলা সরাভাই শ্রীরামপুরে এলেন। ২৮শে ও ২৯শে এই দুই দিন ধ'রে পণ্ডিত নেহরু, আচার্য কৃপালনী, ও শঙ্কররাও দেও মহাত্মার সঙ্গে আলোচনা করলেন। পণ্ডিত নেহরু তাঁর লণ্ডন ভ্রমণের অভিজ্ঞতা ও গণ-পরিষদের প্রথমবারের অধিবেশনের কার্যাবলী মহাত্মাজাকে জানালেন।

২৯শে ডিসেম্বর মহাত্মার প্রার্থনা সভায় নেতৃবৃন্দের শ্রীরামপুর আগমনের জন্য অসম্ভব রকম লোকসমাগম হ'ল। বহুদূর হ'তে অনেক মুসলমান এসেও প্রার্থনা সভায় যোগদান করল। মহাত্মাজী প্রার্থনান্তে নেতৃবৃন্দের প্রথমে পরিচয় দিয়ে বললেন—যদি কেহ এরূপ ভেবে থাকেন যে, মুসলমানদের ক্ষতি করবার জন্য নেতারা এখানে এসেছেন, তা হ'লে তাঁরা ভুল করবেন। কংগ্রেসের মধ্যে হিন্দুর সংখ্যাধিক্য থাকলেও ইহা হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়েরই প্রতিষ্ঠান। তাঁরা সম্পূর্ণ অসাম্প্রদায়িক দৃষ্টি নিয়ে দেশের বর্তমান পরিস্থিতি আলোচনা করবাব জন্যই এখানে এসেছেন।

নোয়াখালির গ্রামপথে মহাত্মাজী ; মহাত্মার বামপার্শ্বে শ্রীযুক্তা সুচেতা
কৃপালনী, সকলের পিছনে শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র দাসগুপ্ত।

তারপর তিনি নিজের কাজের কথা উল্লেখ ক'রে বললেন যে, কেহ কেহ তাঁকে মুসলমানদের শত্রু ব'লে ভেবে থাকেন, কিন্তু তিনি কাজের দ্বারা প্রমাণ করবেন যে, তিনি তাঁদের বন্ধু।

৩০শে ডিসেম্বর পণ্ডিত নেহরু প্রভৃতি নেতৃবৃন্দ শ্রীরামপুর ত্যাগ করলেন। পরদিন মহাত্মা গান্ধী তাঁর প্রার্থনান্তিক অভিভাষণে নেতৃবৃন্দের কথা পুনরায় উল্লেখ ক'রে বললেন যে, তাঁরা শাসনতান্ত্রিক ব্যাপারে উপদেশ গ্রহণের জন্যই তাঁর নিকটে এসেছিলেন। হিন্দু-মুসলমান ঐক্যের ভিত্তিতে যাতে শীঘ্রই শাসনতান্ত্রিক সমস্যার সমাধান হয়, সেইরূপ তাঁর লিখিত অভিমত নিয়ে নেতারা গমন করছেন। ঐ অভিমত আলোচনা ক'রে ওয়ার্কিং কমিটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন। তাঁরা নোয়াখালির অবস্থা স্বচক্ষে দেখবার জন্যও এখানে এসেছিলেন এবং ভারতের অন্যত্র আর যাতে কখন এর পুনরাবৃত্তি না ঘটে, তাহাই তাঁরা ইচ্ছা করেন। গণপরিষদে হিন্দু মুসলমানের বিবাদ মিটিয়ে ফেলবার জন্য তাঁরা তাঁর সাহায্য ও উপদেশপ্রার্থী হয়ে এখানে এসেছিলেন। কারণ কংগ্রেস কখনও কোন সম্প্রদায়েরই বিরোধী নয়।

যে সব আশ্রয়প্রার্থী এই সময় পর্যন্ত স্ব স্ব গৃহে প্রত্যাবর্তন করছিল না, তাদের ফিরিয়ে আনবার জন্য মহাত্মা গান্ধী এই সময়ে ব্যাপকভাবে গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে ভ্রমণের সঙ্কল্প করলেন। তিনি স্থির করলেন, এই ভ্রমণকালে অতি অল্পমাত্র সামগ্রীই সঙ্গে নেবেন এবং যেখানে রাত্রি হবে সেখানেই অবস্থান করবেন।

মহাত্মা গান্ধী ব্যাপকভাবে গ্রাম হ'তে গ্রামান্তরে ভ্রমণের এই পরিকল্পনা পণ্ডিত নেহরুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করবার জন্য মাত্র কয়েকদিনের জন্য পিছিয়ে দিয়েছিলেন। তাঁর যাত্রাপথের মানচিত্র প্রস্তুত হয়ে গেল। এই মানচিত্রে উপক্রত গ্রামগুলির তালিকা ও দূরত্ব নিরূপণ করা

হ'ল। মহাত্মাজীও তাঁর ঐতিহাসিক ভ্রমণের জন্য এই সময়ে প্রস্তুত হয়ে নিলেন।

মহাত্মা গান্ধীর এই ব্যাপক পল্লী-পরিক্রমা নানা কারণে তাঁর ঐতিহাসিক ডাণ্ডি-অভিযান অপেক্ষাও বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। মহাত্মাজী নিজে তাঁর এই ভ্রমণ সম্বন্ধে মনে করলেন—ছোটনাগপুরের নিবিড় অরণ্য পথ দিয়ে শ্রীশঙ্করাচার্য বারাণসী তীর্থযাত্রায় যেমন বেরিয়েছিলেন, এও ঠিক সেইরূপ হবে। মহাত্মাজী এই ভ্রমণকে তাঁর জীবনের কঠিনতম পরীক্ষা ব'লে ভাবলেন এবং এর সাফল্যেই তাঁর অহিংসা আদর্শের সার্থকতা স্থির করলেন।

১লা জানুয়ারী মহাত্মা গান্ধীর শ্রীরামপুরে অবস্থানের শেষদিন গেল। এইদিন তিনি প্রার্থনা সভায় বললেন—আগামীকাল আমি শ্রীরামপুর ত্যাগ করছি। এখন থেকে আমি গ্রাম হতে গ্রামান্তরে গিয়ে ঘরে ঘরে লোকের সংস্পর্শে যাওয়ার চেষ্টা করব। আমি এইটুকু প্রার্থনা করি যে, আমি যখন যেস্থান ত্যাগ করব, সেখানের অধিবাসীরা যেন ভাবেন যে যিনি চলে গেলেন তিনি আমাদের বন্ধু, শত্রু নন। আজ নববর্ষে আমাদের এই প্রার্থনা যে, আমরা সকলেই যেন পরিশুদ্ধ ও অধিকতর যোগ্যতাসম্পন্ন হ'য়ে আমাদের কার্যক্ষেত্রে প্রবেশ করতে পারি।

হিন্দু-মুসলমান মিলনের ব্রত নিয়ে মহাত্মা গান্ধী ২রা জানুয়ারী ভোর সাড়ে সাত ঘটিকার সময় শ্রীরামপুর কুটীর হ'তে চণ্ডীপুর গ্রাম অভিমুখে তাঁর ঐতিহাসিক অভিযান সুরু করলেন। একটি দীর্ঘ বংশদণ্ডের উপর ভর দিয়ে পৌষের প্রখর শীতে মহাত্মাজী মানবতার আবেদন নিয়ে গ্রাম হ'তে গ্রামান্তরে বাহির হলেন। শ্রীরামপুর কুটীরে তিনি প্রায় দেড়মাস

অবস্থান করেছিলেন। এই কুটীর ত্যাগ করবার প্রাক্কালে তিনি বাড়ীর সকলের নিকট হ'তে বিদায় গ্রহণ করলেন।

মহাত্মা গান্ধী এই গ্রাম পরিক্রমাকালে মাত্র চারজনকে তাঁর সঙ্গী হিসাবে নিলেন—তাঁর বাঙ্গলা-দোভাষী অধ্যাপক শ্রীনির্মল বসু, শর্টহাণ্ড লেখক শ্রীপরশুরাম, মহাত্মার নানা কাজে সাহায্য করবার জন্য দক্ষিণভারতের শ্রীরামচন্দ্রন্ ও তাঁর ব্যক্তিগত কাজের ব্যবস্থা করবার জন্য কুমারী মনু গান্ধী।

মহাত্মাজী চণ্ডীপুর অভিমুখে যাবার সময় যখন পল্লীগৃহগুলি অতিক্রম করতে লাগলেন, তখন দেখা গেল, পল্লীর হিন্দু মুসলমানরা তাঁর দর্শন-লাভের আশায় পথিপার্শ্বে সমবেত হয়ে অপেক্ষা করছে। অনেকে তাঁর অনুগমনও করল।

মহাত্মাজী শ্রীরামপুর গ্রামের প্রান্তস্থিত গত হাঙ্গামায় জনৈক ভূতপূর্ব রাজবন্দীর ভস্মীভূত গৃহ পরিদর্শন করলেন। পথে শিবপুরে এক মুসলমান মৌলভীর বাড়ীতে গমন করলেন। উক্ত মৌলভী শ্রীরামপুরে পূর্বদিন গিয়ে মহাত্মাকে নিমন্ত্রণ করে এসেছিলেন।

বেলা ৯টার সময় মহাত্মা গান্ধী চণ্ডীপুর গ্রামে পদার্পণ করামাত্র গ্রাম-সেবা-সঙ্ঘের সভ্যরা "রামধুন" গান আরম্ভ ক'রে দিলেন। মহাত্মা গান্ধী বিশ্রাম গ্রহণ না করা পর্যন্ত এই গান চলতে থাকল। এই গ্রামে তিনি শ্রীঅবনী মজুমদারের বাড়ীতে আশ্রয় গ্রহণ করলেন। বাড়ীতে প্রবেশ করলে বাড়ীর মেয়েরা উলুধ্বনি ক'রে তাঁকে বরণ ক'রে নিলেন।

শ্রীসৌরেন বসুর পরিচালনায় পূর্ব হতেই এই গ্রামে একটি শিবির স্থাপন ক'রে সেবা ও পুনঃপ্রতিষ্ঠার কাজ চলছিল।

চণ্ডীপুর গ্রামের হাঙ্গামার বিবরণ মহাত্মার নিকটে পেশ করা হ'ল।

মহাত্মাজীর সঙ্গে তার চারজন ভ্রমণ-সঙ্গী ব্যতীত—ডাঃ সুশীলা নায়ার, শ্রীসতীশচন্দ্র দাসগুপ্ত, আজাদ হিন্দ ফৌজের সর্দার জীবন সিং, বঙ্গীয় প্রাদেশিক হিন্দুমহাসভার সম্পাদক শ্রীমনোরঞ্জন চৌধুরী প্রভৃতিও তাঁর অনুগমন করলেন।

রয়েটার, ইউ, পি, প্রভৃতি সংবাদ সরবরাহ প্রতিষ্ঠানের ও ভারতের কয়েকটি বিখ্যাত সংবাদপত্রের প্রতিনিধিরাও মহাত্মাজীর সঙ্গে গেলেন। এই সাংবাদিকদল মহাত্মার পল্লী-পরিক্রমার সময় বরাবরই তাঁর সঙ্গে সঙ্গে ছিলেন।

ভ্রমণকালে মহাত্মার নিরাপত্তার জন্য বাংলা সরকার ৮জন সশস্ত্ররক্ষী দলের ব্যবস্থা করেন। মহাত্মা গান্ধী এই রক্ষীদল আদৌ পছন্দ না করলেও বাঙ্গলা সরকারের নির্দেশ অনুযায়ী এই রক্ষা-বাহিনী মহাত্মার পরিক্রমার সময়ে নিরাপত্তা রক্ষায় রত ছিল।

মহাত্মাজীর ভ্রমণকালে কোথাও সুবিধামত আশ্রয় না মিললে, তাঁর থাকার জন্য একটি ভ্রাম্যমান পর্ণ কুটীর প্রস্তুত হয়। এই পর্ণকুটীরটিও চণ্ডীপুরে নিয়ে আসা হ'ল।

এই দিন মহাত্মা গান্ধী তাঁর প্রার্থনা সভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে বললেন যে, তাঁর পল্লী-পরিক্রমা প্রকৃতপক্ষে এখনও আরম্ভ হয় নি। শ্রীরামপুর হ'তে চণ্ডীপুরে তাঁর সফর দপ্তর পরিবর্তন করেছেন মাত্র। এখানে তিনি ৩।৪ দিন অবস্থান করবেন। তারপর তাঁর প্রকৃত সফর আরম্ভ হবে। দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে পুনরায় সম্প্রীতি আনয়ন করাই তাঁর বর্তমান সফরের উদ্দেশ্য। এক সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে অপর সম্প্রদায়কে সুগঠিত করা তাঁর উদ্দেশ্য নয়। এতদিন ভীরু ও দুর্বলের অহিংসার অনুশীলন হচ্ছিল, এইবার সাহসী ও শক্তিমানের অহিংসার কার্য চলবে।

তিনি আরও বললেন—পূর্ব বাঙ্গলা সোনার দেশ হলেও এখানের
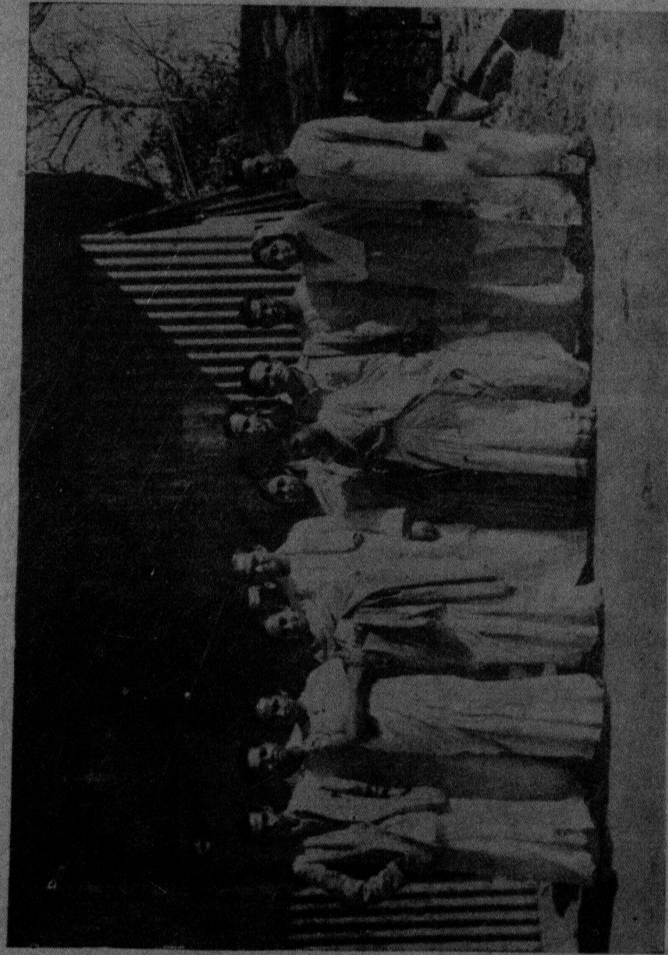
উপক্রুত অঞ্চলের কয়েকজন মহিলা সেবা কর্মী ও মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে ভ্রমণরত সাংবাদিক দলের মধ্যে এই গ্রন্থের লেখক ( ডান দিক থেকে প্রথম ), কুমারী মৃদুলা সরাভাই ( ডানদিক থেকে দ্বিতীয় ), শ্রীযুক্তা সুচেতা কৃপালনী ( মধ্যস্থলে )।

অধিবাসীরা গরীব। গ্রামগুলো মোটেই পরিচ্ছন্ন নয়। পুকুরের জল এত দূষিত যে, হাত ধুতেও সাহস হয় না। আমাদের দেশে ধনীরা ক্রমশ ধনশালী এবং গরীবরা ক্রমে আরও গরীব হয়ে পড়ছে। এই সমাজ ব্যবস্থার মূলে যে শয়তানী চক্র রয়েছে, তাকে ভেঙ্গে সাম্য ও সম্প্রীতির ভিত্তিতে নূতন সমাজ গড়ে তুলতে হবে।

প্রার্থনা সভার পূর্বে ত্রিপুরা হ'তে একদল দুঃস্থ নারী মহাত্মার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে আসে। তিনি তাদের কথা উল্লেখ ক'রে বললেন যে, তাদের সূতা কেটে আয় বাড়াতে তিনি উপদেশ দিয়েছেন। হিন্দু-মুসলমান গরীব পল্লীবাসীরা যদি সূতা কাটতে আরম্ভ করে, তা হলে এতে শুধু তাদেরই মঙ্গল হবে না, সমগ্র ভারতবর্ষের উন্নতি হবে।

এরপর তিনি শ্রীযুক্ত সতীশ চন্দ্র দাসগুপ্ত প্রেরিত স্বেচ্ছাসেবক-দলের কথা উত্থাপন করে বললেন--তাদের বহু বিপদের সম্মুখীন হতে হচ্ছে, এজন্য হয়ত তাদের প্রাণও বিসর্জন দিতে হতে পারে, তবে সাহসে ভর ক'রে প্রেমের বাণী নিয়ে অগ্রসর হ'লে অতিবড় অত্যাচারী ও হৃদয়হীন ব্যক্তিরও হৃদয় জয় করা সম্ভব হবে।

চণ্ডীপুরে যে গৃহে মহাত্মাজী অবস্থান করতেন তার সম্মুখে ৩রা জানুয়ারী মহিলাদের এক সভা হ'ল। তাতে তিনি বললেন—নারীদের অন্য কারও উপর বিশ্বাস না ক'রে ভগবানের উপর এবং নিজেদের আত্মশক্তির উপর নির্ভর করা উচিত। এই বিশ্বাস নিয়ে তাঁদের অধিকতর সাহস অর্জন করতে হবে। ভীত হয়ে পড়লে তাদের আক্রমণ করা দুর্বৃত্তদের পক্ষে সহজ হবে।

এর পর মহাত্মাজী অস্পৃশ্যতা বর্জনের অনুরোধ জানিয়ে বললেন—এখনও অস্পৃশ্যদের দূরে সরিয়ে রাখলে তাঁদের আরও দুঃখভোগ করতে হবে।

মহাত্মার বাসস্থান হতে এক মাইল দূরে অবস্থিত তমালতলা রামকৃষ্ণ আশ্রমে এইদিন প্রার্থনা সভা অনুষ্ঠিত হ'ল। প্রার্থনা সভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে তিনি জনসাধারণকে আলস্য ত্যাগ ক'রে পল্লী-সংস্কার কার্যে আত্মনিয়োগ করতে উপদেশ দিলেন। তিনি বললেন, তারা সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে কাজ করলে তাদের নিকটে কিছুই অসম্ভব বলে মনে হবে না। জনসাধারণ পল্লী উন্নয়নে মনোযোগী হয়েছে দেখলে, তিনি তাঁর সফর সাফল্যমণ্ডিত হয়েছে ব'লে মনে করবেন।

এই সময়ে বিহার দাঙ্গার দুর্গতদের সম্পর্কে কিছুদিন যাবৎ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান হ'তে মহাত্মাজীর নিকটে অসংখ্য পত্র ও নানারূপ বিবরণ আসতে থাকে। বিহারের আশ্রয়প্রার্থীদের প্রতি ব্যবহার নিয়ে বাঙ্গলার প্রধান মন্ত্রী মিঃ সুরাবর্দীও মহাত্মার নিকটে লিখিত এক পত্রে কতকগুলি বিষয়ের অভিযোগ করেন। এ সম্পর্কে মহাত্মা গান্ধী বিহার গবর্ণমেণ্টের নিকটে এক পত্র দেন। মহাত্মাজী যাতে নিজে পরীক্ষা ক'রে দেখতে পারেন, সেই কারণে বিহারের রাজস্ব সচিব শ্রীযুত কৃষ্ণবল্লভ সহায়ের নেতৃত্বে এক প্রতিনিধিদল এ সম্পর্কে সমস্ত কাগজপত্র নিয়ে ৩রা জানুয়ারী অপরাহ্নে চণ্ডীপুরে আসেন। প্রতিনিধিদল মহাত্মাজীর নিকটে এক স্মারকলিপি পেশ করেন। তাতে বিহার গবর্ণমেণ্টের বক্তব্য লিপিবদ্ধ থাকে। এই স্মারকলিপিতে গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে অভিযোগগুলির জবাব দেওয়া হয়। দুর্গতদের সাহায্য ও পুনর্বসতির জন্য গবর্ণমেণ্ট যে সকল ব্যবস্থা করেন, নথিপত্রে তার বিস্তৃত বিবরণ দেখান হয়।

চণ্ডীপুর হতে এক মাইল দূরে কাজিবাজার গ্রামে ৪ঠা তারিখে প্রার্থনা সভা হয়। মৌলবী ফজলল হকের বিশেষ অনুরোধে এখানে প্রার্থনা সভার অনুষ্ঠান করা হয়। প্রার্থনান্তিক ভাষণে মহাত্মাজী

বললেন—অনেকেই আমাকে বাঙলা ত্যাগ ক'রে বিহার যাবার কথা বলছেন, সেখানে নাকি আমার প্রয়োজন এখানের অপেক্ষা বেশী। আমি নোয়াখালি ত্যাগ করতে চাই না, কারণ এখানের কাজ আমার অন্য ধরণের। আমি এখানে থেকে কাজের দ্বারা প্রমাণ করব যে, হিন্দুদের ন্যায় মুসলমানদেরও আমি বন্ধু। মুসলমান সম্প্রদায়ের কেহ কেহ আমাকে তাঁদের প্রধান শত্রু বলে মনে করেন। আমি আমার জীবনে কখনও মুসলমানদের শত্রু ব'লে ভাবি নি। দক্ষিণ আফ্রিকায় মুসলমান বন্ধুদের সঙ্গে আমার জীবনের অনেক মূল্যবান সময় কেটেছে। আপনারা জানেন, আমি এখানে থেকেই সর্বদা বিহার সরকারের সঙ্গে পত্রালাপ করছি এবং বিহার গবর্ণমেণ্টের উপর আমার প্রভাব বিস্তার করছি। গতকাল যে বিহার প্রতিনিধিদল আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এসেছেন, তাঁরাও কিছু গোপন না ক'রে হাঙ্গামার সকল বিবরণ, সেবাকার্যের সকল ব্যবস্থাই জানিয়েছেন।

তিনি আরও বললেন—শোনা যাচ্ছে নোয়াখালির অধিকাংশ আশ্রয়প্রার্থীই এবার গ্রামে ফিরে আসছে। তাদের গৃহ পুনর্নির্মাণ প্রভৃতি কাজে গবর্ণমেণ্টের সাহায্য করা উচিত। বিভিন্ন সেবা প্রতিষ্ঠান আশ্রয়প্রার্থীদের সাহায্য করতে চান, কিন্তু যা গবর্ণমেণ্টের কর্তব্য তা তাঁরা করবেন কেন? গবর্ণমেণ্ট যথোপযুক্ত ব্যবস্থা করতে না পারলে, তাঁরাই জনসাধারণের সাহায্য চাইবেন।

এই প্রার্থনা সভায় মৌলবী ফজলল হকও হিন্দু-মুসলমান সম্প্রীতির জন্য আবেদন জানিয়ে বক্তৃতা করলেন। তিনি কোরাণের একটি উক্তি উদ্ধৃত করে বললেন—ভাইয়ে ভাইয়ে, সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে বা প্রতিবেশীর সঙ্গে বিরোধ কোরাণ সমর্থন করে না।

৭ই জানুয়ারী থেকে মহাত্মার প্রকৃত পক্ষে পল্লী-পরিক্রমা আরম্ভ হ'ল। এখন হ'তে তিনি প্রতিদিন এক একটি উপক্রুত গ্রামে গিয়ে অবস্থান করতে লাগলেন এবং সেই সব গ্রামের হিন্দুদের আশ্রয়প্রার্থী শিবির থেকে ফিরিয়ে আনবার জন্ম ও তাদের পুনর্বসতির ব্যবস্থা করবার জন্ম পণ ক'রে বেরুলেন। মাঝে দু'একটি গ্রামে মাত্র বিশেষ বিশেষ কারণে একাধিক দিন কাটালেন।

মহাত্মা গান্ধী তাঁর এই পল্লী-পরিক্রমাকে তীর্থযাত্রা ব'লে স্থির করেছিলেন, তাই তিনি নগ্নপদে যাত্রা আরম্ভ করলেন। এই সময়ে মহাত্মাজী পায়ের আঙ্গুলে ফোঁড়া হওয়ায় অত্যন্ত যন্ত্রণা অনুভব করছিলেন, কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি ভ্রমণ বন্ধ করতে কিছুতেই সম্মত হ'লেন না।

৭ই জানুয়ারী প্রাতে ৭টা ২৫ মিনিটের সময় তাঁর এই শুভযাত্রা আরম্ভ হ'ল। সেদিন যেমনি পৌষের প্রখর শীত, তেমনি উত্তর বায়ুর প্রবল চাপ। পল্লীর বন্ধুর ও অপরিচ্ছন্ন পথ পরিপূর্ণভাবে শিশির-স্নাত। তা ছাড়া পথের কোথাও কর্দমাক্ত, কোথাও কণ্টকাকীর্ণ। পথের মাঝে মাঝে দুরতিক্রম্য সংকীর্ণ সুপারী গাছের সাঁকো। যার পারাপারের সঙ্গে জীবনমরণের প্রশ্ন জড়িত। এই দুর্গম পথের যাত্রী হলেন এক অশীতি বর্ষীয় বৃদ্ধ। নগ্ন তাঁর পদ। পরণে কটিবাস। ঊর্ধ্বাঙ্গে মাত্র একটা শ্বেত খদ্দরের উত্তরীয়। অকম্পিত হস্তে একটি দীর্ঘ বংশদণ্ড। এইটাই তাঁর ভ্রমণ কালের অবলম্বন। মুখে স্বভাব-সুলভ হাসি। অন্তরে কিন্তু এক বজ্রকঠিন পণ—অত্যাচারিত সংখ্যালঘু হিন্দুর সাথে উৎপীড়ক সংখ্যাগুরু মুসলমানদের মিলন সাধন, নতুবা মৃত্যুবরণ।

মহাত্মা গান্ধী তাঁর শুভযাত্রার পথে পা দিবেন ঠিক এমনি সময়ে, তিনি যে গৃহে অবস্থান করছিলেন, সেই গৃহের গৃহকর্ত্রী একটি থালায়

জলন্ত প্রদীপ সাজিয়ে মহাত্মাকে প্রদক্ষিণ ক'রে তাঁকে বরণ করলেন। তারপর মহাত্মাজীর ললাটে এক উজ্জল সিন্দুরের তিলক এঁকে দিলেন।

এরপর যাত্রা সুরু হ'ল মহাত্মার। অমনি তাঁর সঙ্গীরা গাইতে আরম্ভ করলেন, তাঁর অতি প্রিয় সঙ্গীত "রামধুন"। পথে বেরিয়ে এসে তিনি দেখলেন, তাঁর যাত্রাপথের উভয় পার্শ্বেই অপেক্ষমান নরনারীর এক বিরাট সমাবেশ। তাঁরা এসেছেন মহামানব দর্শনে। এ যুগের পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ মানব মহাত্মা গান্ধী প্রেমের বাণী নিয়ে লোকের দ্বারে দ্বারে বেরোবেন—এই বার্তা লোকের মুখে মুখে দূর দূরান্তরে ছড়িয়ে পড়েছিল। তাই দূরবাসীরাও এসেছে তাঁর দর্শনলাভে। তাদের অন্তরের কামনা, পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষকে শুধু দেখে ধন্য হবে।

মহাত্মা তাঁর গন্তব্যপথে চলতে আরম্ভ করলেন। পথে নারীরা তাঁকে দেখে সমস্বরে উলুধ্বনি দিল। তাঁর সমস্ত যাত্রাপথটির উভয় পার্শ্বেই ঐরূপ লোকসমাবেশ। জনতার অনেকেই অনুগমন করল মহাত্মার। তিনি যতই অগ্রসর হ'তে লাগলেন, তাঁর অনুগামী দলও ততই বর্ধিত হ'তে লাগল।

পথের জনতা তাঁকে থামিয়ে কিছুক্ষণ ধ'রে দেখবার জন্য কি আকুল আবেদন জানাল! তাঁর মুখের বাণী শুনবার জন্য তাদের কি একান্ত অনুরোধ! মহাত্মা গান্ধী পথের মাঝে মাঝে থেমে হিন্দু-মুসলমান মিলনের বাণী শোনাতে লাগলেন। জনতার মধ্য হ'তে কেহ কেহ তাঁকে তাদের বাড়ীতে নিয়ে যাবার জন্য কিরূপ ব্যগ্রতা প্রকাশ করল! একজন এমনও জানাল যে, মহাত্মাজী যদি তার বাড়ীতে একবার পদার্পণ না করেন, তাহ'লে সে আত্মহত্যা করবে। একথা শুনে মহাত্মা গান্ধী নিরুপায়। কর্তব্যের পথে চললেও ক্ষণিকের জন্য তিনি একবার তার বাড়ীতে গেলেন। গৃহী ধন্য হ'ল।

এইভাবে আড়াই মাইল পথ অতিক্রম ক'রে মহাত্মা গান্ধী চণ্ডীপুর থেকে মাসিমপুরে এসে উপস্থিত হলেন। গ্রামে পদার্পণের সঙ্গে সঙ্গেই গ্রামবাসীরা তাঁর প্রিয় সঙ্গীত "রামধুন" গেয়ে তাঁকে বরণ ক'রে নিল। মহাত্মাজী এখানে এসে তাঁর ভ্রাম্যমান কুটীরে অবস্থান করলেন। গ্রাম-সেবা-সঙ্ঘ কর্মীরা তাঁর কাছে গত হাঙ্গামায় গ্রামের ক্ষতির বিবরণ পেশ করলেন। সংখ্যালঘু হিন্দুরা মুসলমানদের হাতে ধন, প্রাণ, মান ও মর্যাদা সকল দিক হ'তে কি নির্মমভাবে অত্যাচারিত হয়েছিল, এ তারই নিদারুণ কাহিনী।

সন্ধ্যায় মহাত্মা গান্ধীর প্রার্থনা সভা বসল। হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের লোকই তাতে যোগদান করল। মহাত্মা প্রার্থনান্তিক ভাষণে পরধর্মমত সহিষ্ণুতার কথা শোনালেন। তিনি বললেন—বিভিন্ন ধর্ম একই বৃক্ষের পত্র বিশেষ। যে, যে নামেই ডাকুক, সেই এক ভগবানকেই ডাকবে। ধর্মমতের মধ্যেও পার্থক্য নেই। ধর্মও এক, ভগবানও এক।

রাত্রি কাটল। মহত্মা গান্ধী আবার চললেন গ্রামান্তরে। পরদিন অন্য গ্রামে। তারপর দিন আবার এক গ্রামে। এইভাবে তিনি দু' তিন মাইল অন্তর অন্তর এক একটা গ্রামে গিয়ে একদিন ক'রে অবস্থান করতে লাগলেন।

তিনি যখন যে গ্রামে গিয়ে পৌছাতে লাগলেন, সেই গ্রামের দুর্গত হিন্দু যারা আশ্রয়প্রার্থী শিবিরে চলে গিয়েছিল এবং তখনও গ্রামে ফির-ছিল না, তারা সেখান থেকে ফিরে আসতে লাগল। তারা গ্রামে এসে মহাত্মাকে সম্বর্ধনা জানাল এবং তাদের ভস্মীভূত গৃহের উপরেই আবার নতুন ক'রে সাময়িকভাবে ঘর তৈরী ক'রে নিল।

পথে মহাত্মাজী অন্যান্য গ্রামের ধ্বংসাবশেষও দেখে যেতে লাগলেন এবং দুর্গতদের দুঃখের কাহিনীও শুনতে থাকলেন।

মহাত্মার এই ভ্রমণ পথে তাঁকে অভ্যর্থনা জানাবার জন্য গ্রামবাসীদের কত রকমেরই না আয়োজন! পথের পাশে গৃহের দ্বারে দ্বারে বহু স্থানেই কদলী বৃক্ষ রোপণ ক'রে তার নিকটে মঙ্গল কলস স্থাপন করা হয়েছে দেখা গেল। পথের উপরে নানা পত্র পুষ্পে সজ্জিত নানা ধরণের তোরণ। তাতে লেখা—বন্দেমাতরম্, জয় হিন্দ, বাপুজী স্বাগতম্ ইত্যাদি। কোথাও কোথাও গ্রামের সারা পথ জুড়ে জাতীয় পতাকায় সুসজ্জিত। পথের উভয় ধারেই হিন্দু-মুসলমান অসংখ্য নরনারীর ভীড়, তারা কোথাও নীরবে দণ্ডায়মান থেকে অভিবাদন জানাল, কোথাও বা তাঁকে ডাব, কমলালেবু প্রভৃতি নানা ফল উপহার দিল। মহাত্মা গান্ধী ফলগুলো উপস্থিত বালক-বালিকাদের মধ্যে বিতরণ ক'রে দিলেন। কোথাও আবার পথের জনতা তাঁকে কিছুক্ষণ থামিয়ে নানা প্রশ্ন করতে লাগল। মহাত্মা তাদের সকল প্রশ্নের সমাধান ক'রে ক'রে যেতে লাগলেন।

মহাত্মা গান্ধী যে গ্রামে গিয়ে যখন পৌঁছাতে লাগলেন, সেখানে তাঁকে বরণ ক'রে নেবার জন্যও গ্রামবাসীদের কি আগ্রহ! গ্রামে উপস্থিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই গ্রামবাসীরা কোথাও "রামধুন" গেয়ে, কোথাও বন্দেমাতরম্ গান গেয়ে, কোথাও খোল করতাল সহযোগে কীর্তন ক'রে, কোথাও ধূপ, ধুনা ও জ্বলন্ত প্রদীপ নিয়ে তাঁকে প্রদক্ষিণ ক'রে, কোথাও বা মেয়েরা উলুধ্বনি দিয়ে ও শাঁখ বাজিয়ে অথবা তাঁর মস্তকে পুষ্প ও লাজ বর্ষণ ক'রে তাঁকে বরণ ক'রে নিল। গ্রাম ত্যাগ করবার সময়ও তাঁকে ঐ একইভাবে বিদায় সম্ভাষণ জানান হ'ল।

পল্লী পরিক্রমার দ্বিতীয় দিন থেকে মহাত্মাজী আর তাঁর ভ্রাম্যমান কুটীরে বাস করা পছন্দ করলেন না। গ্রামে গিয়ে তিনি যার গৃহে আশ্রয় পেলেন, সেখানেই অবস্থান করতে লাগলেন। তবে মুসলমানের

গৃহে আশ্রয় পেলে সর্বাগ্রে সাদরে তাকেই গ্রহণ করলেন। মুসলমানের গৃহের পরেই তিনি হিন্দুর তথাকথিত অস্পৃশ্যদের গৃহে অবস্থান স্থির করলেন।

মহাত্মা গান্ধীর এই ঐতিহাসিক পরিক্রমার সময় সারা সভ্যজগতের দৃষ্টি এদিকে নিবদ্ধ হ'ল। পৃথিবীর নানাস্থান থেকে লোকে তাঁর এই শান্তি অভিযান দেখতে এল। এমনকি আমেরিকার বিখ্যাত চিত্র প্রতিষ্ঠান মেট্রো গোল্ডউইন মায়ার কোম্পানীও মহাত্মার এই ভ্রমণ চিত্র তুলে নিল।

মহাত্মা গ্রামে গিয়ে উপস্থিত হলেই গ্রামের সেবা-সঙ্ঘের কর্মীরা তাঁর কাছে দাঙ্গায় গ্রামের ক্ষতির বিবরণ পেশ করলেন। এই বিবরণ ছাড়াও তিনি নিজে দুর্গতদের কাছ থেকে তাদের নিদারুণ দুঃখের কাহিনী শুনতে লাগলেন। দুর্গত হিন্দুরা দুর্বৃত্ত মুসলমানদের হাতে তাদের পিতা, পুত্র, ভ্রাতা প্রভৃতিকে কি ভাবে হারিয়েছে, তা শোনাল। দুর্বৃত্তরা তাদের কিভাবে মুসলমান ধর্মে ধর্মান্তরিত করেছে, কিভাবে তাদের গোমাংস খেতে বাধ্য করেছে, নারীদের কিভাবে তাদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে গেছে, তারও করুণ কাহিনী বর্ণনা করল। এছাড়া গুণ্ডারা হিন্দুদের ঘরবাড়ী কিভাবে পুড়িয়েছে ও ধ্বংস করেছে, তিনি সেগুলোও স্বচক্ষে দেখলেন।

এইভাবে পল্লীপরিক্রমার পথে মহাত্মা গান্ধী ২১ই জানুয়ারী তারিখে লামচর গ্রামে এসে উপস্থিত হলেন। আসার সময় পথে তিনি দুটি ভস্মীভূত গৃহ পরিদর্শন করলেন। এদের একটির গৃহকর্তা মহাত্মার নিকটে তার দুঃখের কাহিনী বলল। মহাত্মাজী তাকে তার দুর্দশার কথা নোয়াখালির পুলিশ সুপারিন্টেন্‌ডেন্ট মিঃ আবদুল্লাকেও জানাবার কথা বললেন। ঐদিন মিঃ আবদুল্লাও মহাত্মার সঙ্গে গ্রাম পরিক্রমার সময়ে

ছিলেন। অপরাহ্নে লামচরের অদূরে আজিমপুর গ্রামে চারদিকে ধানক্ষেতের মধ্যে অবস্থিত উঁচুপাড় বিশিষ্ট একটি পুকুর থেকে কতকগুলো গলিত শব ও বিচ্ছিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ উদ্ধার করা হয়। দুজন পুলিশ অফিসারের উপস্থিতিতে হিন্দুরা ডুব দিয়ে পুকুর থেকে শব গুলো তুলেছিল। দাঙ্গার সময় মুসলমানরা হিন্দুদের কেটে ঐ পুকুরে ডুবিয়ে রেখেছিল। ঐ শবগুলো এনে লামচর স্কুল প্রাঙ্গণে রাখা হ'ল। ঐখানেই মহাত্মা গান্ধীর সেদিনের প্রার্থনা সভার ব্যবস্থা হয়েছিল। তিনি প্রার্থনা সভায় যাবার সময় গলিত শবগুলো দেখলেন এবং প্রাণে তীব্র বেদনা অনুভব করলেন।

পরদিন ১২ই সকালে মহাত্মা লামচর থেকে করপাড়া গ্রামে গেলেন। সেখানে যেস্থানে তিনি অবস্থান করলেন, তার সামনেই ছিল রায় সাহেব রাজেন্দ্রলাল রায় চৌধুরীর বাড়ী। হাঙ্গামার সময় ইনি গ্রামের বহু হিন্দু নর-নারীকে নিজের বাড়ীতে আশ্রয় দিয়ে দুর্বৃত্তদের সঙ্গে লড়েছিলেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাঁর বাড়ীর সকল পুরুষসহ তিনি গুণ্ডাদের হাতে নিহত হয়েছিলেন। এই গ্রামের বহু পরিবার হাঙ্গামায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। এই সময়ে এখানে সেবাগ্রাম আশ্রমের শ্রীযুক্তা সুশীলা পাই মহাত্মার নির্দেশ অনুযায়ী সেবা কাজে নিযুক্ত ছিলেন।

১৩ই সকালে মহাত্মা গান্ধী করপাড়া থেকে গ্রামান্তরে যাওয়ার পূর্বে করপাড়া গ্রামের পূর্বদিকে একটি ভস্মীভূত গৃহ দেখতে গেলেন। সেখানে এক বৃদ্ধা তাঁর এক মর্মবিদারী কাহিনী মহাত্মাজীকে শোনালেন। মাত্র ছমাসের এক পৌত্রকে কোলে নিয়ে কিভাবে তিনি তাঁর স্বামী ও পুত্রকে হারিয়েছিলেন, তারই করুণ কাহিনী বর্ণনা করলেন। বৃদ্ধার পুত্রবধূটিও নিকটে দাঁড়িয়ে কাঁদছিল, মহাত্মা সস্নেহে ঐ বৃদ্ধার পৌত্রটির গায়ে হাত বুলিয়ে দিলেন।

এইদিন এইসময়ে নোয়াখালির পুলিশ সুপারিনটেন্‌ডেণ্ট মিঃ আবদুল্লাও মহাত্মাজীর সঙ্গে ছিলেন। তিনি বললেন—ঐ বৃদ্ধার স্বামী নোয়াখালি হাঙ্গামার নেতা ভূতপূর্ব এম, এল, এ, গোলাম সারওয়ার ও তাঁর পিতা দুজনেরই শিক্ষক ছিলেন। দুই দফায় ১৭ হাজার টাকা চাঁদা, অলঙ্কার এবং মূল্যবান জিনিষ পত্র দিয়েও তিনি নিজেকে রক্ষা করতে পারেন নি। দুর্বৃত্তরা তাঁর গৃহেই তাঁকে হত্যা করে। পুত্রটির খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না। সম্ভবত তিনিও নিহত হয়েছেন।

১৩ই জানুয়ারী মহাত্মা গান্ধী ৫০ মিনিট পথ হেঁটে সকাল ৮৷৷০ টায় করপাড়ার দু'মাইল দক্ষিণে অবস্থিত সাহাপুর গ্রামে গিয়ে উপস্থিত হলেন। সাহাপুর আসার সময়ে মহাত্মা পথে একটি বাতগ্রস্ত রোগী দেখতে পেলেন। সে মহাত্মাজীর নিকটে আশীর্বাদ চাইতে লাগল। মহাত্মার আশীর্বাদে সে সেরে উঠবে, মহাত্মা গান্ধীর আধ্যাত্মিক শক্তিতে এইরূপ বিশ্বাস ক'রে রোগীটিকে ঐস্থানে এনে রাখা হয়েছিল। মহাত্মাজী চিকিৎসার জন্য তাকে মধুপুর ক্যাম্প হাসপাতালে যেতে বললেন।

পথের মধ্যে বহুস্থানেই অনেকে মহাত্মাকে শঙ্খ ধ্বনি ও উলুধ্বনি ক'রে সম্বর্ধনা জানালেন। সাহাপুর বাজারের মধ্য দিয়েই তিনি গেলেন। এইস্থানেই সর্বপ্রথম নোয়াখালির হাঙ্গামা সুরু হয়েছিল।

সাহাপুর বাজারে যেখান থেকে দাঙ্গার সূত্রপাত হয়, সেই স্থানটা দেখবার জন্য মহাত্মা গান্ধী দুপুরের দিকে একবার সদলে বাজারে গেলেন। তিনি যখন বাজারের উপর দিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন বাজারের খরিদ্দার ও বিক্রেতারা দলের মধ্যে কোন্ ব্যক্তি মহাত্মা গান্ধী এই নিয়ে আলোচনা করছিল। মহাত্মার শিখ সঙ্গী দীর্ঘাবয়ব সর্দার জীবন সিংকে একজন মহাত্মা গান্ধী ব'লে অনুমান করল। এই সময়ে অপর একজন

বৃদ্ধ মুসলমান মহাত্মাকে দেখিয়ে তাঁর সঙ্গীদের বললেন—এতদিন ধ'রে যিনি দেশের সেবায় জীবন কাটালেন, তিনিই এই মহাত্মা গান্ধী।

মহাত্মার সহগামী একজন মুসলমান রাজকর্মচারী বৃদ্ধের এই কথা শুনতে পেয়ে তাঁকে বললেন—এতদিন যদি আপনারা এ কথাটা বুঝতে পারতেন, তাহ'লে কোন চিন্তাই থাকত না।

১৪ই জানুয়ারী তারিখে ভাটিয়ালপুরে মহাত্মা যাঁর গৃহে অবস্থান করেন, সেই গৃহকর্তার একান্ত ইচ্ছা অনুযায়ী তুমুল উৎসব আয়োজনের মধ্যে মহাত্মা গান্ধী তাঁর গৃহে রাধাকৃষ্ণ মূর্তির পুনঃ প্রতিষ্ঠা করলেন। দাঙ্গার সময় দুর্বৃত্তরা এই মূর্তি নষ্ট ক'রে দিয়েছিল। এই সময়ে ভাটিয়ালপুরে মহাত্মা গান্ধীর সেক্রেটারী পিয়ারীলালজী গ্রাম সেবার কাজ নিয়ে এখানে অবস্থান করছিলেন।

পল্লী-পরিক্রমার পথে মহাত্মা গান্ধী ২০শে জানুয়ারী তারিখে শিরণ্ডী গ্রামে এসে উপস্থিত হলেন। এখানে সেবাগ্রাম আশ্রমবাসী তাঁর মুসলমান শিষ্যা কুমারী আমতুস সালাম মহাত্মার নির্দেশ অনুযায়ী হিন্দু-মুসলমান মিলনের কাজে ব্যাপৃত ছিলেন। তিনি তাঁর স্বধর্মী মুসলমানদের মধ্যে বিশেষ সাড়া না পেয়ে, তাদের মনের পরিবর্তন আনবার জন্য অনশন আরম্ভ করেন। মহাত্মা যেদিন এই গ্রামে এলেন, সেদিন তাঁর অনশনের ২৪ দিন চলছিল। মহাত্মা গান্ধী গ্রামে পৌছেই প্রথমে শিষ্যা আমতুসের শয্যা-পার্শ্বে গেলেন। মহাত্মার আবার সেদিন ছিল মৌনব্রতের দিন। মৌনী মহাত্মা নীরবে আমতুসের কপালে হাত রেখে ব্যাকুল নেত্রে তাঁর মুখের দিকে চেয়ে রইলেন। কুমারী আমতুসও দীর্ঘ অনশনে বাক্‌শক্তি হীনা। নীরবে মনের ভাব মুখে প্রকাশ করবার চেষ্টা করছিলেন। এই দৃশ্য অত্যন্ত মর্মস্পর্শী হয়ে উঠল।

অপরাহ্ণে মহাত্মার মৌনব্রত ভঙ্গ হ'ল। স্থানীয় মুসলমানরা হিন্দু-

মুসলমান মিলনে সচেষ্ট হবে—এরূপ এক লিখিত প্রতিজ্ঞাপত্র মহাত্মাজীর নিকটে দাখিল করল। তখন মহাত্মা স্বহস্তে কমলা নেবুর রস খাইয়ে কুমারী আমতুসের অনশন ভঙ্গ করালেন।

পল্লী-পরিক্রমার সময়ে মহাত্মা গান্ধী একদিকে যেমন গ্রামে গ্রামে ঘুরে দুর্গতদের দুর্দশার কাহিনী শুনে, তাদের দুঃখে সান্ত্বনার প্রলেপ দিতে লাগলেন, অপরদিকে ঠিক তেমনি দিনের পর দিন তাঁর প্রার্থনান্তিক ভাষণে হিন্দু-মুসলমানের মিলনের কথা প্রচার করতে লাগলেন এবং নোয়াখালির ধ্বংসস্তুপের উপরে উভয় সম্প্রদায়ের জন্যই নতুন ক'রে অর্থনৈতিক ও সামাজিক ব্যবস্থা গ'ড়ে তুলবার জন্য গ্রামবাসীদের উপদেশ দিলেন। পল্লীর পথ ও পুষ্করিণী সংস্কারের কথা বললেন। কৃষকদের উন্নতির বিষয় নিয়ে আলোচনা করলেন। সূতা কেটে দরিদ্র গ্রামবাসীদের আয়ের পথ দেখিয়ে দিলেন। একদিকে অত্যাচারিত সংখ্যালঘু হিন্দুদের যেমন শেখালেন, শত্রুকে ক্ষমা করতে, তেমনি উৎপীড়ক সংখ্যাগুরু মুসলমানদের বললেন, অত্যাচারিতকে ভালবাসতে এবং পুনরায় তাকে বন্ধু ব'লে সাদরে গ্রহণ করতে। অত্যাচারীদিগকে তিনি নিজ নিজ ভুলের জন্য অনুতাপ করতে এবং ভগবানের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করতে উপদেশ দিলেন।

গ্রাম-পরিক্রমার সময় কতকগুলো গ্রামে যে সব স্থানে মহাত্মার প্রার্থনা সভার অনুষ্ঠান হয়েছিল, সেই সব স্থানের মালিকরা মহাত্মাজীকে সেই স্থানগুলো দান করলেন। মহাত্মা আবার সাধারণের কাজে লাগবার জন্য সেই স্থানগুলোর ব্যবস্থা ক'রে দিলেন।
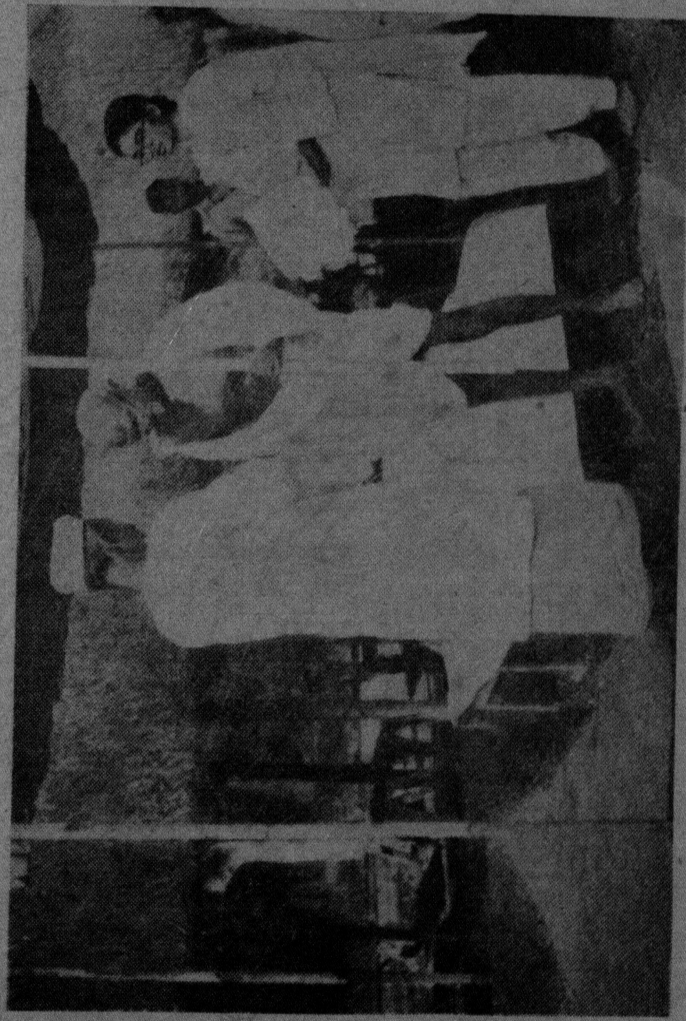
নোয়াখালির একজন মুসলমান মহাত্মাকে সম্বর্ধনা জানাচ্ছেন ;
পাশে দাঁড়িয়ে কুমারী মনু গান্ধী।

এইসময় প্রতিদিনই মহাত্মা গান্ধীর প্রার্থনা সভায় হাজার হাজার লোক জমা হোত, এক এক দিন ২০।২৫ হাজার পর্যন্ত লোক জমৃত এবং এক এক দিন এমনও হোত যে, সভায় শতকরা ৮০ জন পর্যন্ত মুসলমান উপস্থিত থাকত। মহাত্মা হিন্দু-মুসলমান উভয়কেই পরস্পরের ধর্মমতকে শ্রদ্ধা করতে ও সহনশীল হ'তে উপদেশ দিতেন। তিনি বলতেন— নোয়াখালির হিন্দু-মুসলমান পুনরায় বন্ধুত্ব ভাবে মিলিত হ'য়ে কাজ করছে দেখতে পেলেই আমি সানন্দে নোয়াখালি ত্যাগ করব, তবে কিন্তু আমাকে ভুল বোঝাবার চেষ্টা করলে চলবে না। কারণ আমি আমার সংকল্পের জন্য প্রাণ দিতেও প্রস্তুত। কেহ কেহ লুণ্ঠিত দ্রব্য প্রত্যর্পণ করবার কথা বলছেন শুনছি, এতে তাঁরা সে প্রকৃত অনুতপ্ত এরূপ মনে করা যায় না। হয়ত পুলিশের হাতে ধরা পড়বার ভয়েই এখন লুণ্ঠিত দ্রব্যগুলো ফেরৎ দেবার জন্য ব্যস্ত হ'য়ে উঠেছেন। আমি চাই আত্মশুদ্ধি, যদি সত্য সত্যই তাঁরা অনুতপ্ত হন, তবে প্রকাশ্যে দোষ স্বীকার করবেন এবং তাঁরা গ্রেপ্তারেরও ভয় করবেন না। এরূপ ক্ষেত্রে সকলেই তাঁকে ক্ষমা করবেন।

মহাত্মা গান্ধী দিনের পর দিন তাঁর প্রার্থনা সভায় হিন্দু, মুসলমান, নারী, পুরুষ, সেবা-কর্মী সকলেই উপদেশ দিতে লাগলেন। হিন্দু নারীদের উদ্দেশ্য ক'রে তিনি বললেন—সাধারণত মেয়েদের অবলা বলা হ'য়ে থাকে, কিন্তু একথা আদৌ বিশ্বাস্য নয়। কারণ সীতা বা সাবিত্রী কোনও পুরুষ অপেক্ষা কম সাহসী ছিলেন না। হিন্দুনারীদের সীতা ও সাবিত্রীর মতই সাহসী হ'তে হবে। বাইরের সাহায্যের কথা ছেড়ে দিয়ে, তাদের আত্মশক্তি ও ভগবানে বিশ্বাস রাখতে হবে।

মহাত্মা গান্ধী মেয়েদের দিনে অন্তত একঘণ্টা ক'রে সূতা কাটার উপদেশ দিলেন। তিনি বললেন—এতে সংসারের আয় বাড়বে, দেশের

তাঁতিদের সুতার অভাব মিটবে এবং দেশের বস্ত্রসমস্যারও কিছুটা সমাধান হবে।

হিন্দু-মেয়েদের অস্পৃশ্যতা দূর করবার জন্যও তিনি উপদেশ দিলেন। ২৩শে ফেব্রুয়ারী মহাত্মাজী তাঁর পল্লী-পরিক্রমার ৪৫ শ গ্রাম চরকৃষ্ণপুর ত্যাগের প্রাক্কালে কয়েকজন মহিলা তাঁকে ফুল উপহার দেন। এই সময় উচ্চবর্ণের কয়েকজন হিন্দুমহিলার অস্পৃশ্যতা বোধ দেখে, তিনি অত্যন্ত ব্যথিত হলেন। তখন তিনি তাঁদের জিজ্ঞাসা করলেন—তাঁরা কোন নিকৃষ্টতম অস্পৃশ্য দেখেছেন কি না। তিনি বললেন—আমিই সেই অস্পৃশ্য, অতএব আমাকে যদি আপনাদের উপহার দেবার কিছু থাকে, তবে দূর থেকে ছুঁড়ে দিন।

মুসলমান মেয়েদের পর্দাপ্রথার আলোচনা প্রসঙ্গে বললেন—এই প্রথা ইসলামের নবী যা শিখিয়েছেন, তার বিরোধী। দেহের উপর পর্দা দেওয়ায় কোন লাভ হয় না, কারণ পর্দা হ'ল আসলে অন্তরের জিনিষ। কেহ যদি পর্দার মধ্যে থেকে অন্য পুরুষকে চিন্তা করে, তাহ'লে তার পর্দার সার্থকতা কোথায়? অন্তরের অন্ধকার দূর না হলে, বাইরে পর্দা দেওয়ার কোন অর্থ হয় না। মুসলমান মেয়েদের প্রকৃত শিক্ষার প্রয়োজন।

গ্রাম-সেবা-সঙ্ঘের কর্মীদের উপদেশ দিয়ে বলতে লাগলেন—তরবারির দ্বারায় তরবারি রোধ করা যায় বটে, কিন্তু তার ফল কখনও শুভ হয় না। কর্মীদের মন থেকে হিংসা ভাব সম্পূর্ণভাবে দূর করতে হবে এবং তাদের নির্ভয় হতে হবে। তবেই তারা ১জনে ১০০জনের সমান শক্তি অর্জন করতে পারবে। লাঠির জবাবে লাঠি দেখালে সমস্যার সমাধান হবে না, কেবল ভালবাসার দ্বারাই হৃদয় জয় করতে হবে।

গ্রামের যুবকদের লক্ষ্য ক'রে বললেন—যারা কাজের জন্ম গ্রামের বাইরে থাকতে বাধ্য হয়েছে, তাদের পালা ক'রে দলে দলে এসে গ্রামের সেবা করা উচিত।

মুসলমানরা হাঙ্গামার সময় হিন্দুদের জোরপূর্বক যে মুসলমানধর্মে দীক্ষিত ক'রেছিল, সেই ধর্মান্তরিতকরণের কথা তুলে মহাত্মা গান্ধী মুসলমানদের বললেন—ধর্মান্তর গ্রহণ অন্তরের জিনিষ। বল প্রয়োগে এ সম্ভব নয়। যে ব্যক্তি অন্ত ধর্ম গ্রহণ করবে, তার সেই ধর্ম সম্বন্ধে ও নিজের ধর্ম সম্বন্ধে গভীর জ্ঞান থাকা উচিত। দুর্ভিক্ষের সময় একশ্রেণীর খৃষ্টান ধর্মযাজক শিশুদের ক্রয় ক'রে খৃষ্টান করত। একে খৃষ্টধর্ম গ্রহণ বলা যায় না। আমি গভীর নিষ্ঠা সহকারে মুসলমান মনীষীদের ইসলামের ইতিহাস পাঠ করেছি, কিন্তু কোথাও বলপূর্বক ধর্মান্তরিত করণের সমর্থন দেখি নি। হিন্দু-ধর্ম গ্রহণ করবার জন্ম কেহ আমার কাছে এলে, আমি তাকে এই উপদেশ দিই যে, হিন্দুশাস্ত্র পাঠ ক'রে যা কিছু ভাল জিনিষ পাবেন, তা নিজের ধর্মের সঙ্গে যুক্ত ক'রে নিন। আমি নিজে হিন্দু হলেও নিজেকে কিন্তু হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান, পার্শী, ইহুদি প্রভৃতি সকল ধর্মেরই লোক ব'লে মনে করি। কারণ আমি সকল ধর্মেরই সার গ্রহণ করেছি। হিন্দু মুসলমান প্রত্যেকেরই পরস্পরের ধর্মবিশ্বাসে শ্রদ্ধাবান হওয়া উচিত। কারণ এটা তাদের বোঝা দরকার যে, একজনের নিকটে তার নিজের ধর্ম যেমন প্রিয়, অপরের নিকটে সেই ব্যক্তির ধর্মও তারই মতন প্রিয় এবং ইহাও জানা উচিত যে ধর্মান্তর গ্রহণ সম্পূর্ণ স্বাধীন ও স্বেচ্ছাকৃত ব্যাপার।

১লা ফেব্রুয়ারী আমিষাপাড়ায় মহাত্মার প্রার্থনা সভায় প্রায় ১৫ হাজার লোক সমবেত হয়েছিল এবং সভায় শতকরা ৯০ জনই ছিল

মুসলমান। এইদিন তিনি তাঁর মুসলমান শ্রোতাদের বললেন—ঈশ্বরকে যে বিভিন্ন নামে উপাসনা করা যেতে পারে, এর বিরুদ্ধে কোরাণে কোন উল্লেখ নেহ। ধার্মিকব্যক্তির পরিচয় হ'ল অন্তরের নির্মলতায়। একসঙ্গে লুণ্ঠন ও নরহত্যা করা এবং ভগবানের নাম নেওয়া ধার্মিকের লক্ষণ নয়।

মহাত্মাজী মুসলমান শ্রোতাদের জন্য মাঝে মাঝে কোরাণ ও হজরৎ মহম্মদের বাণীও উদ্ধৃত ক'রে শোনাতেন। ১৯শে জানুয়ারী তাঁর পল্লী-পরিক্রমার ত্রয়োদশ গ্রাম বাদলকোটে প্রার্থনা সভায় এইরূপ নবী মহম্মদের বাণী উদ্ধৃত ক'রে শোনালেন। মহম্মদের সেই উদ্ধৃত বাণীগুলি ছিল—

"নিজের জন্য যা কামনা কর, তোমার ভ্রাতার জন্যও তাই কামনা করবে, তা না করলে তুমি আস্তিক নও।

"নিজের কিংবা পরের কল্যাণের জন্য কাজ না করলে, আল্লার আশীর্বাদ লাভ করা যায় না।

"অবিশ্বাসী, মিথ্যাবাদী ও প্রতিশ্রুতি ভঙ্গকারী আল্লার ভক্ত নয়, সে আল্লাদ্রোহী।

"ঈশ্বরের সৃষ্ট জীবে যাঁরা দয়া দেখান, তাঁরা ঈশ্বরের করুণা লাভ করেন।

"যিনি কথায় ও কাজে মানব জাতির সেবা ও উদ্ধারে সচেষ্ট, তিনিই খাঁটি মুসলমান।

"কুশিক্ষিতরা সর্বাপেক্ষা মন্দ এবং সুশিক্ষিতরা সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠমানুষ। যিনি ব্যাভিচারে আসক্ত ইসলাম তাকে ত্যাগ করে।

"ব্যাভিচারী, মাতাল, চোর, জুয়াচোরেরা মোমিন নয়, তাদের সম্বন্ধে সাবধান হ'তে হবে।

"যারা জ্ঞানানুযায়ী কাজ করে, তারাই প্রকৃত শিক্ষিত।"

যে সকল মুসলমান শ্রমিক হিন্দু ভূম্যাধিকারীদের জমি চাষ বয়কট করেছিল, তাদের লক্ষ্য ক'রে তিনি বললেন—এই বয়কটের কথা যদি সত্য হয়, তা হ'লে সত্যই দুঃখের কথা। জমি শুধু ভূমির মালিকের জন্য কেন, রাষ্ট্রের জন্যও চাষ করা উচিত। কারণ ফলের জন্য জমির মালিক অপেক্ষা গবর্ণমেণ্টেরই এ বিষয়ে বেশী উদ্বেগ থাকা দরকার। এজন্য জমির মালিকরা সরকারের নিকটে সাহায্য চাইবেন এবং গবর্ণমেণ্টও সমস্ত চাষ ঠিকমত হচ্ছে কিনা দেখবেন। জমির মালিক হিন্দুই হোক্, আর মুসলমানই হোক্, মুসলমান শ্রমিকদের চাষ করবার জন্য উপদেশ গবর্ণমেণ্টকেও দিতে হবে। অবশ্য শ্রমিকরা যাতে উপযুক্ত পারিশ্রমিক পায় তাও গবর্ণমেণ্টের দেখা কর্তব্য।

মুসলমানদের কাছে মহাত্মার এই সব আবেদন প্রচারের ফলে, বহু মুসলমানের মধ্যে সত্যই পরিবর্তন দেখা গেল। ৮ই ফেব্রুয়ারী তারিখে নন্দীগ্রামে মহাত্মা গান্ধী তাঁর প্রার্থনাসভায় বললেন—নোয়াখালিতে কিছু মুসলমানের মনের যে বর্তমানে পরিবর্তন হয়েছে, একথা বলা যেতে পারে। ভাটিয়ালপুরের একজন মুসলমানের কথাই বলি। তিনি বলেছেন—হাঙ্গামার সময় হিন্দুদের মন্দির ভেঙ্গেছি সত্য, কিন্তু এখন যদি কোন মুসলমান ঐ মন্দির ভাঙ্গতে আসে, তা হ'লে আমার প্রাণ দিয়ে আটকাব।

পল্লী-পরিক্রমার সময় মহাত্মা গান্ধী হিন্দুদের নির্ভীক হতে এবং ভগবান ভিন্ন অপর কা'কেও ভয় না করতে উপদেশ দিতে লাগলেন। তাঁর এই উপদেশে হিন্দুরা সাহসে ভর ক'রে আশ্রয়প্রার্থী শিবির থেকে গ্রামে ফিরে এল। তাদের মধ্যে অনেকে এমন কি মেয়েরাও নৈতিক সাহসও অর্জন করল। এইরূপ একদিনের ঘটনায় দেখা গেল—মেয়েরা

আশ্রয়প্রার্থী শিবির থেকে গ্রামে ফিরে এসেছে। গ্রামে তাদের নিজ নিজ কাজের ঠিকমত ব্যবস্থা না থাকায় তারা সমবায় প্রথায় কাজ করছে। একদিন সকালে মেয়েরা একত্র হয়ে রামধুন গেয়ে কাজে চলেছে, এমন সময় প্রতিবেশী মুসলমানরা তাদের বলল—তোদের ধিক্, তোরা নয় এই সেদিন কল্‌মা পড়ে মুসলমান হ'লি, আজ আবার রামনাম করছিস। তখন সেই হিন্দু মেয়েরা সাহসের সঙ্গে বল্‌ল—হ্যাঁ সত্যই আমরা সেদিন ভয়ে মুসলমান হয়েছিলুম। কিন্তু আজ আর আমাদের কোন ভয় নেই। আজ আর একবার কই কলমা পড়াতে এসে দেখ, আমরা অহিংস থেকে মরব, তবু কলমা আর পড়ব না।

মেয়েদের এই সাহসের কথা শুনে মুসলমানরা হতবাক হয়ে চলে গেল।

মহাত্মা গান্ধী তাঁর পল্লী-পরিক্রমার সময় হিন্দুধর্মের জাতিভেদ-প্রথা-রূপ গলিত ব্যাধি দূর করবার জন্যও বলতে লাগলেন। তিনি বললেন—হিন্দুধর্মকে যদি বেঁচে থাক্‌তে হয়, তবে তাকে জাতিভেদ প্রথা তুলে দিতে হবে। তিনি নিজের কথা উল্লেখ ক'রে বলতেন—আমি যে হিন্দুর কোন্ জাতিভুক্ত ছিলাম তা বহুদিন ভুলে গেছি, বর্তমানে নিজেকে ভাঙ্গী ব'লে পরিচয় দিতে এবং তদনুযায়ী কাজ করতে আমি আনন্দ বোধ করি। স্বাধীন ভারতে এই জাতি ভেদ প্রথা অতীতের কাহিনী ব'লেই পরিগণিত হবে, আমি এইরূপ আশা করি।

মহাত্মার এই অস্পৃশ্যতা বর্জনের প্রচারেও কিছুটা সুফল দেখা দিল। নোয়াখালিতে নতুন ক'রে জাতিভেদ হীন সমাজ গড়ে উঠতে লাগল।

মহাত্মার পরিক্রমার ফলে মুসলমানদের যেমন অল্পবিস্তর মতির পরিবর্তন হ'ল, হিন্দুরাও তেমনি অনেকে প্রকৃত নির্ভয় হয়ে গ্রামে ফিরে এল। মহাত্মা গান্ধী আশ্রয়প্রার্থী শিবির থেকে প্রত্যাগত লোকদের

গৃহ নির্মাণ, তাদের সাহায্য ও কাজের ব্যবস্থা ক'রে দেবার জন্য গবর্ণমেণ্টকেও চাপ দিতে লাগলেন। গবর্ণমেণ্টও মহাত্মার উপদেশ মত দুর্গতদের পুনর্বসতির কাজে এগিয়ে এলেন এবং হাঙ্গামায় যাদের ঘরবাড়ী ভস্মীভূত হয়েছিল, তাদের বাড়ী নির্মাণ ক'রে দিতে লাগলেন। ৩০শে জানুয়ারী আমকি গ্রামে মহাত্মা গান্ধী গবর্ণমেণ্টের তৈরী এইরূপ একটি টিনের ঘরের সমালোচনা ক'রে, সেইদিন তাঁর সঙ্গে ভ্রমণরত নোয়াখালির জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটকে ঘরটি দেখিয়ে বললেন—একে ঘর না ব'লে বাক্স বললেই ভাল হয়। তাছাড়া ঐ টিনের ছোট্ট কুটরীর মধ্যে লোক থাক্‌লে গ্রীষ্মকালে সে ত ভাজা হয়ে যাবে। এ রকম না ক'রে বাঁশ, খড়, নারিকেল পাতা প্রভৃতি এ সব অঞ্চলে যা পাওয়া যায়, তাই দিয়েই ঘর ক'রে দিন। জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট মহাত্মার প্রস্তাব গ্রহণ ক'রে সেই অনুযায়ী কাজ করবার সম্মতি জানালেন।

এইভাবে ভ্রমণ করতে করতে ২৪শে ফেব্রুয়ারী তারিখে মহাত্মা গান্ধী তাঁর ভ্রমণ সূচীর দ্বিতীয় পর্যায়ের শেষ গ্রাম হাইমচরে এসে উপস্থিত হলেন। হাইমচরে মহাত্মা গান্ধীর নির্দেশক্রমে নিখিল ভারত হরিজন সেবক সংঘের সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত এ. ভি. ঠক্কর গঠনমূলক কাজে ব্যাপৃত ছিলেন। মহাত্মা এখানে এসে তাঁরই আতিথ্য গ্রহণ করলেন।

পল্লী-পরিক্রমার প্রথম পর্যায়ে মহাত্মা গান্ধী ২৮টি গ্রামে এবং দ্বিতীয় পর্যায়ে ১৮টি গ্রামে গিয়ে অবস্থান করলেন। তাঁর ভ্রমণসূচীর এই গ্রাম কয়টি ছাড়া তিনি এক গ্রাম থেকে অপর গ্রামে গিয়ে থাকবার সময় অসংখ্য গ্রামের উপর দিয়ে গেলেন এবং সর্বত্রই ধ্বংসাবশেষ দেখলেন ও দুর্গতদের দুঃখের কাহিনী শুনলেন। মহাত্মা ৭ই জানুয়ারী যাত্রা আরম্ভ ক'রে ৩ রা ফেব্রুয়ারী তাঁর ভ্রমণসূচীর প্রথম পর্যায়ের শেষ গ্রাম সাধুরখিলে এসে পৌছলেন। এখানে দুদিন অবস্থান করলেন। ৫ই

থেকে আবার তাঁর পল্লী-পরিক্রমার দ্বিতীয় পর্যায় আরম্ভ হ'ল। এই পর্যায়ে তিনি নোয়াখালি ছাড়া ত্রিপুরা জেলারও গ্রামে গ্রামে গেলেন। পরিক্রমার পথে ত্রিপুরায় আলুনিয়া গ্রামে তিনি প্রথম প্রবেশ করলেন ১৮ই ফেব্রুয়ারী তারিখে। দ্বিতীয় পর্যায়ে বিজয়নগর ও রায়পুর গ্রামে তিনি দু'দিন ক'রে কাটালেন।

হাইমচর ও এর পার্শ্ববর্তী কয়েকটা গ্রামের অধিবাসীর অধিকাংশই নমঃশূদ্র। হাইমচরে একটা প্রকাণ্ড বাজার ছিল। মুসলমানরা বাইরে থেকে দলবদ্ধ ভাবে এসে বাজারটা লুঠতরাজের পর আগুন লাগিয়ে পুড়িয়ে দেয়। এতে বাজারের প্রায় ৪০ লক্ষ টাকার ক্ষতি হয়। তাছাড়া দুর্বৃত্তরা এখানে অনেক দেবমন্দির এবং হিন্দুদের ঘর বাড়ীও ধ্বংস ক'রে দেয়।

মহাত্মাজী এখানে কয়েকদিন অবস্থান করলেন। তাঁর পল্লী পরিক্রমার তৃতীয় পর্যায়ের মানচিত্র প্রস্তুত হ'তে লাগল, কিন্তু এই সময়ে বিহারের উন্নয়ন সচিব ডাঃ মামুদ তাঁর সেক্রেটারীর হাতে এক দীর্ঘ পত্র দিয়ে মহাত্মাকে একবার অন্তত বিহারে যাবার জন্য আমন্ত্রণ ক'রে পাঠালেন।

২৮ ফেব্রুয়ারী মহাত্মা গান্ধী তাঁর প্রার্থনা সভায় শ্রোতাদের বললেন—শীঘ্রই আমি হয়ত কয়েকদিনের জন্য একবার বিহার প্রদেশে যাব। সেখানের হিন্দুরা যা করেছে, নোয়াখালি ও ত্রিপুরার ঘটনা তার কাছে একপ্রকার তুচ্ছ। বিহারের অবস্থার উন্নতি সম্বন্ধে আমি যেরূপ আশা করেছিলাম সেরূপ হয়নি, তাই বিহারের উন্নয়ন সচিব আমাকে একবার যাওয়ার জন্য আমন্ত্রণ পাঠিয়েছেন। তবে এতে পূর্ববঙ্গের জনসাধারণের নিরাশ হবার কিছু নেই। আমার সহকর্মীরা এখানে থেকে যাচ্ছেন। হিন্দু-মুসলমান মিলনের জন্য তাঁরা প্রাণ দিতেও কুণ্ঠা বোধ করবেন না।

পরদিন ১লা মার্চ তারিখে প্রার্থনা সভায় মহাত্মা গান্ধী পুনরায় তাঁর
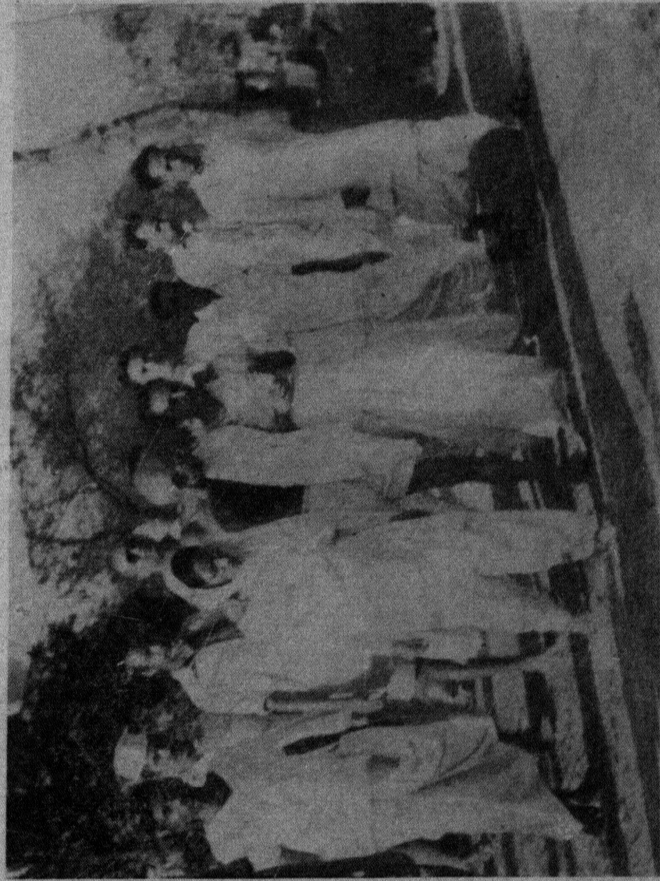
হাইমচরে সদলে মহাত্মা গান্ধী ; ছবির ডানদিকে প্রথমেই এই গ্রন্থের লেখক।

বিহার যাওয়ার কথা উল্লেখ ক'রে বললেন —আগামী কাল আমি এখান থেকে বিহার চলে যাচ্ছি। আগামী কালের প্রার্থনা সভাও আর এখানে হবে না, চাঁদপুরে হবে। আমি বিহার গেলেও শীঘ্রই বিহার থেকে ফিরে আসব। তখন আবার নতুন ক'রে গ্রাম পরিক্রমায় বেরুব। আমি যে সব গ্রামে যাবার কথা দিয়েছি, এবার এসে সেই সব গ্রামে যাবার চেষ্টা করব।

২রা মার্চ বেলা দু'টার সময় মহাত্মা গান্ধী হাইমচর ত্যাগ ক'রে বিহারের পথে রওনা হলেন। জীপে ২৫।২৬ মাইল এসে অপরাহ্নে তিনি চাঁদপুরে স্বর্গীয় হরদয়াল নাগের গৃহে উপস্থিত হলেন। এইদিন ডাকাতিয়া নদীর তীরে তাঁর প্রার্থনা সভার অনুষ্ঠান হ'ল। প্রার্থনা সভায় তাঁর অভিভাষণের প্রথমেই তিনি স্বর্গীয় হরদয়াল নাগের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করলেন। তারপর বললেন, একবার তিনি আলি ভ্রাতৃদ্বয় এবং খুব সম্ভব মৌলানা আজাদকে নিয়ে তাঁর আতিথ্য গ্রহণ করেছিলেন। এরপরে তিনি তাঁর বিহার যাত্রার কথা উল্লেখ ক'রে বললেন—বাঙ্গলার মুসলমান নেতারা আমাকে এতদিন ধ'রে বিহার যাবার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছিলেন, কিন্তু আমার বিশ্বাস ছিল, আমি পূর্ববাঙ্গলায় বসেই বিহারের উপর আমার প্রভাব বিস্তার করতে পারব। তাই তাঁদের আবেদনে এতদিন কান দিইনি। সম্প্রতি বিহারের উন্নয়ন সচিব ডাঃ মামুদের নিকট থেকে এক পত্র পেয়ে জানতে পারলাম যে, আমি যেমনটি চেয়েছিলাম ঠিক সেরূপ হয়নে। তাই সেখানে একবার যাওয়া মনস্থ করেছি। আমি শীঘ্রই ফিরে আসব। ইতিমধ্যে এখানের হিন্দু-মুসলমান ভাইরা সম্প্রীতিতে বাস করবেন, এই কামনা করি।

প্রার্থনার পর মহাত্মাজী ৺হরদয়াল নাগের গৃহে কিছুক্ষণ অপেক্ষা

করলেন। রাত্রি প্রায় ৮৷৹ টার সময় বিহার রওনা হবার জন্য তিনি তাঁর বিশ্রামকক্ষ হ'তে বাইরে এলেন এবং জোড় হস্তে সকলের কাছ থেকে বিদায় নিলেন। উপস্থিত সকলেই মহাত্মাকে নমস্কার জানাল। এই সময়ে বাড়ীর মেয়েরা শাঁখ বাজিয়ে ও উলুধ্বনি ক'রে, দ্বিতলের উপর থেকে মহাত্মার মস্তকে পুষ্প ও লাজ বর্ষণ করতে লাগল। স্টীমার ঘাট পর্যন্ত মহাত্মাজী মোটরে গেলেন। তারপর রাত্রি ৯টার সময় "মার্লিন" নামক একখানা স্পেশাল স্টীমারে ক'রে তিনি চাঁদপুর থেকে বিহার অভিমুখে রওনা হলেন।

# বিহারে

নোয়াখালি ও ত্রিপুরার অমানুষিক অত্যাচার ও নির্মম হত্যাকাণ্ডে ব্যথিত হ'য়ে, ২৮শে অক্টোবর (১৯৪৬) তারিখে মহাত্মা গান্ধী দুর্গতদের সেবার জন্য নয়াদিল্লী হ'তে পূর্ববঙ্গ অভিমুখে যাত্রা করেন। তাঁর এই যাত্রাপথে সোদপুর খাদি-প্রতিষ্ঠানে কয়েকদিন অবস্থান ক'রে তিনি যখন বাঙ্গলার গবর্ণর ও তাঁর প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে পূর্ববঙ্গের হাঙ্গামা নিয়ে আলোচনা করছিলেন, ঠিক সেই সময়ে বিহারের সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দু সম্প্রদায় সেখানকার সংখ্যালঘু মুসলমান সম্প্রদায়ের উপর পূর্ববঙ্গের অত্যাচারের প্রতিশোধ নেবার নেশায় মত্ত হয়ে ওঠে। প্রথমত লীগের 'প্রত্যক্ষ সংগ্রামে' কলকাতার হত্যাকাণ্ডে বহু বিহারী-হিন্দু আত্মীয় স্বজন হারিয়ে দেশে ফিরে মুসলমান সম্প্রদায়ের উপর একটা বিরূপ আবহাওয়ার সৃষ্টি ত ক'রেই রেখেছিল, তদুপরি পূর্ববঙ্গে আবার হিন্দুদের উপর অত্যাচার হওয়ায়, বিহারী হিন্দুরা স্থানীয় মুসলমানদের উপর প্রতিশোধ নিতে আরম্ভ ক'রে দিল। এখানে মুসলমানদের ধর্মান্তরিত করণ ও নারীহরণ না চললেও হত্যাকাণ্ড যা ঘটল, তা নোয়াখালির ঘটনাকেও অতিক্রম ক'রে গেল।

বিহারের কংগ্রেস গবর্ণমেণ্ট এই দাঙ্গা দমন করবার জন্য অবিলম্বেই কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করলেন। পণ্ডিত নেহরু, ডাঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ, আচার্য কৃপালনী প্রভৃতি কংগ্রেস নেতারা সংবাদ পেয়েই বিহারে ছুটে এলেন এবং দাঙ্গা নিবারণের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করতে লাগলেন।

বিহারী হিন্দুদের এই ব্যাপারে মহাত্মা গান্ধী অত্যন্ত মর্মাহত হ'য়ে পড়লেন। এদিকে তাঁর নোয়াখালি যাত্রার সকল ব্যবস্থাই ঠিক হয়ে যাওয়ায়, তিনি আর বিহার ফিরতে পারলেন না। সোদপুরে অবস্থানকালে এই সময় তিনি একদিন তাঁর প্রার্থনা সভায় বললেন—অতি বাল্যকাল হ'তে আমি অন্যায়কে ঘৃণা করতে শিখেছি কিন্তু অন্যায়কারীকে নয়। মুসলমানরা যদিও অন্যায় ক'রে থাকে তা হ'লেও তারা আমার বন্ধু। তবে তারা যে অন্যায় করেছে, একথাও আমি বলব। তাই ব'লে প্রতিহিংসায় শান্তি আসবে না। এ মনুষ্যত্বের পথ নয়। হিন্দুশাস্ত্রে ক্ষমাকে শ্রেষ্ঠধর্ম বলা হয়েছে এবং সেই ক্ষমা সাহসী ব্যক্তিরই করবার অধিকার। হত্যা, অগ্নিসংযোগ, বলপূর্বক ধর্মান্তরিতকরণ এবং স্ত্রীলোকের উপর অত্যাচার ইসলাম ধর্মেও সমর্থন করে না। এক ব্যক্তি চড় মারলে তাকে পাল্টা চড় মারার অর্থ বুঝি, কিন্তু যে চড় মেরে পালিয়েছে, তাকে না পেয়ে তার আত্মীয় বা তার স্বধর্মীকে চড় মারা মানুষের পক্ষে অমর্যাদাকর। তাই নোয়াখালির প্রতিশোধ বিহারে নেওয়া যেতে পারে না। রক্তের বদলে রক্ত চাই, এরূপ প্রতিশোধ মনোবৃত্তি বর্বরসুলভ। বিহারের ঘটনায় আমি যথেষ্ট মর্মপীড়া অনুভব করছি।

৪ঠা নভেম্বর মহাত্মা গান্ধী এক পত্রে রাজ কুমারী অমৃত কাউরকে লিখলেন—স্বাস্থ্যের জন্য আমি কলকাতায় আসার পর থেকে দুধ ছাড়া সামান্য মাত্র খাদ্য গ্রহণ করছি। বিহারে যা ঘটেছে তার পরিবর্তন না হ'লে আমি সম্পূর্ণ অনশন গ্রহণ করব।

পরদিন তিনি পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু ও সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলকেও দু'খানা পত্র দিলেন এবং উভয়কেই জানালেন—বিহারের ঘটনা আমাকে বিশেষভাবে নাড়া দিয়েছে। বিহারের যে সংবাদ

শুনছি, তার অর্ধেক সত্য হলেও বুঝব, বিহারে মনুষ্যত্ব লোপ পেয়েছে। আমার বিবেক বলছে—এই কাণ্ডজ্ঞানহীন হত্যাকাণ্ড দেখবার জন্ম তোমার বেঁচে থাকায় লাভ কি ? স্থির করেছি, এই হত্যাকাণ্ড না থামলে, আমি আমরণ অনশন করব, এই মর্মে এক বিবৃতি প্রকাশ করব মনস্থ করেছি।

পণ্ডিত নেহরু পাটনা হ'তে টেলিফোনে মহাত্মা গান্ধীকে এর উত্তরে জানালেন— যতদিন আবশ্যক হবে, ততদিন আমি বিহারেই অবস্থান করব। নয়াদিল্লী অপেক্ষা বিহারেই আমার অবস্থান এখন প্রয়োজনীয় ব'লে মনে করি। আপনার বিহার আসার প্রয়োজন নেই।

৬ই নভেম্বর প্রাতে নোয়াখালি যাত্রার পূর্বমুহূর্তে মহাত্মা গান্ধী বিহারবাসীদের প্রতি এক বিবৃতি দিলেন। তাতে তিনি বললেন—বিহার সম্বন্ধে আমার যে মহান্ ধারণা ছিল, বিহারবাসীরা নিজেদের আচরণের দ্বারায় তা মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে। বিহারের শতকরা ১৪জন মুসলমানকে বর্বরের ন্যায় হত্যাকরার মধ্যে কোথাও জাতীয়তার চিহ্ন মাত্র নেই। বিহারীরা হয়ত বলতে পারেন, দু'একহাজার বিহারীর এই অন্যায় কাজের জন্ম সকল বিহারীকে দোষী করা যায় না। কিন্তু এক ব্রজকিশোর প্রসাদ বা রাজেন্দ্র প্রসাদের জন্ম কি সমগ্র বিহার গর্ব অনুভব করে না ? বিহারী হিন্দুদের এই অপকার্য কায়দে-আজম জিন্নাকে বিদ্রূপ করবার সুযোগ দিয়েছে। এতে মিঃ জিন্না বলতে পারেন—কংগ্রেস সকল সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠান ব'লে গর্ব ক'রলেও আসলে কিন্তু হিন্দুর প্রতিষ্ঠান। বিহারের কয়েক হাজার লোকে মিলে মাত্র কয়েক শত মুসলমানকে হত্যা ক'রে সাহসের কাজ ব'লে তারা যা গণ্য করছে, তার মধ্যে সাহসিকতার কিছু নেই। এ কাপুরুষতা হতেও নিকৃষ্ট এবং জাতীয়তা ও ধর্মের নিকটে কলঙ্ক

বিহারী হিন্দুদের কর্তব্য বিহারের সংখ্যালঘু মুসলমানদের ভাইএর মত দেখা এবং তাদের রক্ষণাবেক্ষণ করা। যে সব মুসলমান ভয়ে পালিয়েছে, বিহারী হিন্দুদের কর্তব্য তাদের পুনরায় ফিরিয়ে আনা। যাদের ঘরবাড়ী নষ্ট হয়েছে, তাদের ঘর পুনরায় তৈরী ক'রে না দেওয়া পর্যন্ত বিহারী হিন্দুদের ক্ষান্ত হওয়া উচিত নয়। আমার স্বাস্থ্যের জন্য কলকাতায় আসার পর থেকে আমি স্বল্পাহার গ্রহণ করছিলাম। বিহারের ঘটনার পর প্রায়শ্চিত্ত করবার জন্য সেই স্বল্পাহারই বজায় রেখেছি। উন্মত্ত বিহারীরা যদি তাদের মতি পরিবর্তন না করে, তাহলে এই অল্প আহারও ত্যাগ ক'রে আমি আমরণ অনশন গ্রহণ করব।

মহাত্মা গান্ধীর এই বিবৃতি বিহারী হিন্দুদের কানে পৌছান মাত্রই যাদুমন্ত্রের মতন সমস্ত দাঙ্গা একেবারে বন্ধ হয়ে গেল। অতঃপর মহাত্মাজী নোয়াখালিতে বসেই বিহারের দুর্গতদের সেবা ও পুনর্বসতির জন্য বিহারের কংগ্রেস গবর্ণমেণ্টকে উপদেশ দিয়ে নিজের প্রভাব চালাতে লাগলেন। বিহার গবর্ণমেণ্ট মহাত্মা গান্ধীর উপদেশ অনুযায়ী কাজ ক'রে চললেও, কয়েকটি মুসলিম প্রতিষ্ঠান হ'তে কেবলই মহাত্মার নিকটে অভিযোগ আসতে লাগল। এমন কি বাঙ্গলার প্রধান মন্ত্রী মিঃ সুরাবর্দীও তাঁর নিকট একটি লিখিত পত্রে বিহারী মুসলমানদের পক্ষ হ'তে কতকগুলি অভিযোগের কথা জানালেন এবং নোয়াখালি অপেক্ষা বিহারেই তাঁর অধিক প্রয়োজন ব'লে তাঁকে বিহার যাবার জন্য অনুরোধ করলেন।

মহাত্মা গান্ধী এই সকল অভিযোগের কথা জানিয়ে বিহার গবর্ণমেণ্টকে এক পত্র দিলেন। পত্র পেয়ে বিহার গবর্ণমেণ্ট তাঁদের সেবা ও পুনর্বসতির কাজের সমস্তই যাতে মহাত্মাজী বুঝতে পারেন,

সেজন্য সকল কাগজপত্র দিয়ে বিহারের রাজস্ব সচিব শ্রীযুক্ত কৃষ্ণবল্লভ সহায়ের নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধিদলকে জানুয়ারী মাসের প্রথম দিকে নোয়াখালি প্রেরণ করলেন। দুর্গতদের সাহায্যের জন্য তাঁরা যে সব কাজ করতেছিলেন, সমস্তই মহাত্মাজীকে দেখালেন। এ ছাড়া প্রতিনিধিদল মহাত্মার নিকটে এক স্মারকলিপিও পেশ করলেন। তাতে বিহার গবর্ণমেণ্টের বক্তব্য লিপিবদ্ধ ছিল এবং গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে অভিযোগগুলোর উত্তর দেওয়া হয়েছিল।

অতঃপর মহাত্মা গান্ধী নোয়াখালিতে অবস্থান ক'রে একদিকে যেমন সেখানের অত্যাচারিত হিন্দুদের সেবা করতে লাগলেন, অপর দিকে বিহারের কংগ্রেস গবর্ণমেণ্টের উপর নিজের প্রভাব আরোপ ক'রে বিহারের দুর্গত মুসলমানদেরও সেবা করতে লাগলেন। এইভাবেই কাজ চলতে লাগল। কিন্তু ফেব্রুয়ারীর শেষ দিকে বিহারের উন্নয়ন সচিব ডাঃ মামুদ তাঁর সেক্রেটারীর হাতে এক পত্র দিয়ে তাঁকে মহাত্মাজীর নিকটে পাঠিয়ে দিলেন। পত্রে জানালেন যে, মহাত্মা গান্ধী বিহার সম্বন্ধে যেরূপ আশা ক'রে ছিলেন, ঠিক সেরূপটি হ'য়ে উঠছে না। অতএব বিহারে তাঁর একবার আসা বিশেষ প্রয়োজন হ'য়ে পড়েছে।

এই পত্র পেয়েই মহাত্মা গান্ধী নোয়াখালি-ত্রিপুরায় তাঁর আরব্ধ কাজ অসমাপ্ত রেখে এবং সঙ্গীদের উপরে তার ভার দিয়ে, কিছুদিনের জন্য মাত্র যাচ্ছেন ব'লে নিজে বিহার চলে এলেন।

৫ই মার্চ প্রাতে মহাত্মা গান্ধী পাটনায় গিয়ে উপস্থিত হলেন। পাটনায় তিনি ডাঃ মামুদের গৃহে আশ্রয় গ্রহণ করলেন। ঐদিন ডাঃ রাজেন্দ্র প্রসাদের ভগিনী শ্রীমতী ভগবতী দেবী তাঁকে তিলক ও মাল্য ভূষিত করতে গেলে, তিনি বললেন—ঐসবের জন্য তিনি বিহার আসেন নি, বিহারের দুর্ভাগ্যের জন্য তিনি অশ্রুবিসর্জন করতে এসেছেন।

৬ই মার্চ বাঁকীপুর ময়দানে প্রার্থনার শেষে মহাত্মাজী এক বিরাট জনতার সম্মুখে বক্তৃতা দিলেন। তিনি বললেন—নোয়াখালির হিন্দুরা যেমন মুসলমানদের ভয়ে ভীত, এখানের মুসলমানরাও তেমনি হিন্দুদের ভয়ে ভীত হয়েছে। এখানে মুসলমানরা যে, বিহারী হিন্দুদের ভয়ে চলে যাচ্ছে, এতে হিন্দুদের পক্ষে গৌরবের কিছুই নেই। বিহারের হিন্দুরা একটি অন্যায়ের প্রতিশোধ নিতে গিয়ে, আর একটি অন্যায় পথ অবলম্বন করেছে। যদি প্রতিপক্ষের সহিত সংগ্রাম করতেই হয়, তবে ভালবাসার দ্বারাই তা করা উচিত, স্নেহের দ্বারাই তাকে অভিভূত করা কর্তব্য। এখানের মুসলমানরা যে দিন বলবে যে, হিন্দুরা আর তাদের শত্রু হ'তে পারে না, সে দিনই আমি সন্তুষ্ট হব।

এরপর কয়েকদিন ধ'রে প্রার্থনা সভায় মহাত্মা গান্ধী দুষ্কৃতকারীদের দোষ স্বীকার করবার উপদেশ দিলেন, দুর্গত মুসলমানদের সেবার জন্য বিহারীহিন্দুদের নিকটে অর্থ সাহায্যের আবেদন করলেন এবং বিহারী মুসলমানদের সাহসী হতে বললেন ও ভগবান ভিন্ন অপর কাকেও ভয় করতে নিষেধ করলেন।

১০ই মার্চ বাঁকীপুর ময়দানে প্রার্থনা সভায় মহাত্মাজী সমবেত হিন্দু নরনারীর নিকটে বললেন—আজ আপনাদের দুর্গত মুসলমানদের জন্য স্বহস্তে দান করতে হবে এবং আমি নিজে তা গ্রহণ করব।

মহাত্মাজীর মুখ থেকে এই কথা বেরোবার পরই এক অভাবনীয় ঘটনা ঘটে গেল। সমবেত নরনারী সকলেই কিছু না কিছু দান করবার জন্য তাঁর নিকটবর্তী হতে ব্যস্ত হয়ে উঠল। মহাত্মা গান্ধী একঘণ্টারও অধিককাল ধ'রে এই দান গ্রহণ করলেন: সঙ্গে সঙ্গেই কয়েক হাজার নগদ টাকা, বহু স্বর্ণালঙ্কার সংগৃহীত হয়ে গেল। এর পরেও তিনি আরও কয়েকদিন ধ'রে স্বহস্তে এইরূপ অর্থ সংগ্রহ করলেন।

১৩ই মার্চ তারিখে পাটনার ছ' মাইল দূরে আবদুল্লাচকে মহাত্মার প্রার্থনা সভার অনুষ্ঠান হ'ল। প্রার্থনা সভায় যাত্রার পূর্বে তিনি পারসা নামক একটি গ্রামে গেলেন। গ্রামের হিন্দু অধিবাসীরা তাঁকে এক পত্র দিয়ে লিখিত ভাবে জানাল যে, মুসলমানরা ফিরে এলে তারা তাদের সর্বপ্রকারে সাহায্য করবে এবং তারা ফিরে আসুক, ভগবানের নিকটে তারা এই প্রার্থনাই করছে। মহাত্মাজী বিহারের দুর্গত মুসলমানদের জন্য যে অর্থভাণ্ডার খোলেন, তাতে দেবার জন্য তারা তাঁর হাতে একটা টাকার তোড়া দিল।

ঐসময় মহাত্মা গান্ধী পাটনায় অবস্থান ক'রে, শহর হতে ২০ মাইল পর্যন্ত দূরে দূরে গিয়ে বিধ্বস্ত গৃহাদি দর্শন করতে লাগলেন এবং স্থানীয় হিন্দু ও লীগ নেতাদের সঙ্গে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে পূর্বেকার সৌহার্দ্য ফিরিয়ে আনবার জন্য আলোচনা করতে লাগলেন।

এরপর পাটনা জেলার দক্ষিণপূর্ব অঞ্চলের উপদ্রুত অঞ্চল পরিদর্শন করবার জন্য মহাত্মা গান্ধী একখানা স্পেশাল ট্রেণে ক'রে ১৭ই মার্চ পাটনা ত্যাগ করলেন। সীমান্ত গান্ধী খান আবদুল গফুর খান্ তাঁর সঙ্গী হলেন। ক'দিন ধ'রে তিনি বহু বিধ্বস্ত গ্রাম পরিদর্শন করলেন। সবত্রই তিনি প্রার্থনা সভায় মুসলমানদের সাহসী হ'তে, দুষ্কৃতকারীদের দোষ স্বীকার করতে ও হিন্দুদের দুর্গত মুসলমানদের সাহায্য করতে উপদেশ দিলেন। মহাত্মার এই উপদেশের ফলে হিন্দুরা সাগ্রহে মুসলমানদের অর্থ সাহায্য ও গৃহাদি পুনর্নির্মাণের জন্য আগিয়ে এল এবং দুষ্কৃতকারীদের মধ্যে অনেকেই নিজেদের দোষ স্বীকার ক'রে মহাত্মাজীর নিকটে পত্র দিল। মহাত্মা গান্ধী ৬ দিন গ্রামাঞ্চলে ভ্রমণের পর ২২ তারিখে পাটনায় ফিরে এলেন।

২৬শে তারিখে মহাত্মা গান্ধী খান আবদুল গফুর খান্, কুমারী মৃদুলা

সরাভাই ও কুমারী মনু গান্ধীকে সঙ্গে নিয়ে পুনরায় জাহানাবাদ মহকুমা পরিদর্শন করতে তিন দিনের জন্য পাটনা ত্যাগ করলেন এবং বহু গ্রাম ঘুরে বিধ্বস্ত গৃহাদি পরিদর্শন করলেন। লীগ-কর্মীরা অনেক স্থানেই মহাত্মাকে বিধ্বস্ত গৃহাদি দেখাল।

দুর্গত গ্রামাঞ্চলে আরও ব্যাপকভাবে ঘুরবার জন্য ভ্রমণসূচী প্রস্তুত হতে লাগল, কিন্তু এই সময়ে বড়লাট লর্ড মাউণ্টব্যাটেন ভারতের রাজনৈতিক জটিল অবস্থা আলোচনা করবার জন্য মহাত্মা গান্ধীকে নয়াদিল্লীতে আমন্ত্রণ জানালেন। মহাত্মাজী আমন্ত্রণ পেয়ে বিহারে ২৫ দিন অবস্থানের পর ৩০শে মার্চ নয়াদিল্লী যাত্রা করলেন।

বিহারে মহাত্মা গান্ধীর অল্প কয়েকদিন অবস্থানেই অবস্থার যথেষ্ট উন্নতি হ'ল। হিন্দুরা অর্থ ও অলঙ্কারাদি দিয়ে মুসলিম সাহায্য ভাণ্ডার ভরে দিল। তাঁরা মুসলমানদের সাহায্য করবার জন্য সর্বপ্রকারে আগিয়ে আসতে লাগল। মুসলমানরাও অনেকেই বিশ্বাস নিয়ে নিজ নিজ গৃহে ফিরে আসতে আরম্ভ করল। মহাত্মা গান্ধীর আহ্বানে বিহারের দুষ্কৃতকারীদের মধ্যে অনেকেই নিজেদের দোষ স্বীকার ক'রে শাস্তি নিতে প্রস্তুত হ'ল। শুধু এই ঘটনা হতেই সম্যকরূপে বুঝতে পারা গেল যে, মহাত্মাজীর বিহার ভ্রমণে কিরূপ সাড়া পাওয়া গিয়েছিল।

বড়লাটের সঙ্গে আলোচনা শেষ হলেই মহাত্মা গান্ধী পুনরায় বিহারে ফিরে আসাই তাঁর কর্তব্য ব'লে স্থির করলেন। তাই তিনি ১৩ই এপ্রিল নয়াদিল্লী হ'তে পুনরায় পাটনায় ফিরে এলেন।

১৫ই এপ্রিল বড়লাটের উদ্যোগে বড়লাট-প্রাসাদ হ'তে, হিন্দু-মুসলমান দুই সম্প্রদায় যাতে পরস্পর হিংসা কার্যকলাপ বন্ধ করে, তজ্জন্য মহাত্মা গান্ধী ও মিঃ জিন্নার এক যুক্ত আবেদন প্রচার করা হয়। ১৬ই
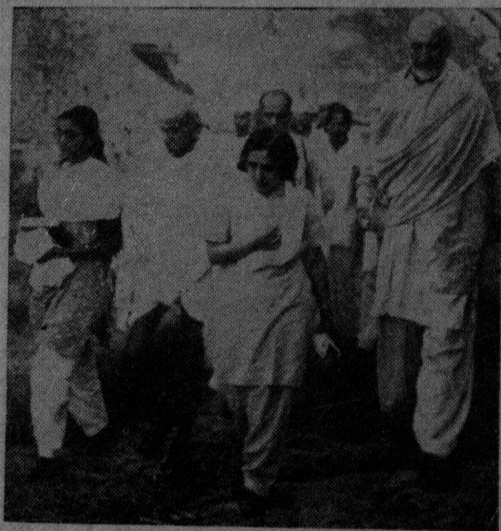
সীমান্ত গান্ধী খান আব্দুল গফুর খানের সঙ্গে বিহারের বিধ্বস্ত অঞ্চলে মহাত্মাজী ; মহাত্মার বামে কুমারী মৃদুলা সরাভাই, ডান পাশে কুমারী মনু গান্ধী ।

এপ্রিল বাঁকিপুর ময়দানে প্রার্থনা সভায় মহাত্মাজী এই যুক্ত আবেদনের কথা উত্থাপন করলেন। তিনি বললেন—এই প্রকার আবেদন প্রচারের চেষ্টা করার জন্য বড়লাট সকলেরই ধন্যবাদের যোগ্য। তবে বড়লাটের মধ্যস্থতা ভিন্ন মিঃ জিন্না ও আমি এই প্রকারের আবেদন প্রচার করতে পারলে আরও ভাল হোত। যাই হোক্ মিঃ জিন্না বড়লাটের নিকটে এই প্রচার পত্রে সহি ক'রে আমার সমান অংশীদার হয়েছেন। তিনি যদি ইচ্ছা করেন, তাহলে তাঁর স্ব সম্প্রদায়কে তিনি সহজেই শান্ত করতে পারেন। আমি হিন্দু হিসাবে কিন্তু ওতে স্বাক্ষর করি নি। কারণ আমি হিন্দু হিসাবে কোন কাজ করি নি। প্রত্যেক ধর্মই আমার সমান প্রিয়, আমি বিশ্বাস করি যে, সকল ধর্মের ভিত্তিই এক। ভগবানের নিকটে এই প্রার্থনা করছি যে, তিনি ভারতবাসীকে এই সুমতি দিন যেন তারা পরস্পর ভ্রাতৃবিরোধ হ'তে বিরত হয়।

মহাত্মা গান্ধী পাটনায় অবস্থান ক'রে দিনের পর দিন প্রার্থনা সভায় শান্তির বাণী প্রচার করতে লাগলেন এবং দাঙ্গা-বিধ্বস্ত জনসাধারণের মনে আস্থার ভাব ফিরিয়ে আনবার জন্য শান্তি কমিটির সদস্যদের শান্তি-কার্য বিষয়ে নির্দেশ দিতে থাকলেন। কয়েকদিন অবস্থানের পর মহাত্মা গান্ধী নয়াদিল্লীতে ১লা মে থেকে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির যে সভার স্থির হয়, তাতে উপস্থিত থাকবার জন্য পণ্ডিত নেহরু ও রাষ্ট্রপতি আচার্য কৃপালনীর নিকট হ'তে আহ্বান পেয়ে ৩০ এপ্রিল পুনরায় পাটনা ত্যাগ করলেন।

নয়াদিল্লীতে বাঙ্গলা কংগ্রেসের এক প্রতিনিধি দল মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে সাক্ষাৎ ক'রে বাঙ্গলার অবস্থা তাঁকে জানালে, তিনি নয়াদিল্লীর কাজ শেষ হ'লে, সেখান থেকে বিহারে না গিয়ে ৭ই মে তারিখে সিধা একেবারে কলকাতা অভিমুখে রওনা হলেন। কলকাতায় মাত্র ছ দিন

অবস্থান ক'রে পুনরায় তিনি বিহার যাত্রা করলেন ও পাটনায় ডাঃ সৈয়দ মামুদের আতিথ্য গ্রহণ করলেন।

পাটনায় পৌছে ঐদিনই ১৫ই মে সন্ধ্যায় বাঁকিপুর ময়দানে প্রার্থনা সভায় মহাত্মাজী বললেন—বিহারের কাজ অসমাপ্ত রেখে আমি কলকাতায় গেলেও আমার মন বিহারেই ছিল। বিহার, কলকাতা, কি নোয়াখালি যেখানেই আমি থাকি না কেন, ফল একই হবে; কারণ ভারতের দুইটি বিবদমান সম্প্রদায়ের মধ্যে মিলন সাধনের জন্যই আমি আমার জীবন উৎসর্গ করতে কৃতসঙ্কল্প।

মুসলমানদের তোষণ করবার জন্য মহাত্মাজী বিহারে এসেছেন, এক ব্যক্তির এইরূপ এক মন্তব্যের উত্তরে তিনি ঐদিন প্রার্থনা সভায় বললেন—সমগ্রজীবন আমি অন্যায়ের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করছি, কারও তোষামোদ আমার জীবনের ধর্ম নয়। মনুষ্য সমাজের কল্যাণের জন্য কাজ ক'রে যাওয়াই আমার জীবনধর্ম। এর মধ্যে কোথাও তোষামোদের স্থান নেই। কোন ব্যক্তি সত্যবাদী, অহিংস, অকপট ও বিবেকের দ্বারা পরিচালিত হ'লে, সে কারও তোষামোদ করতে পারে না।

১৬ই তারিখে পাটনার সাত মাইল দূরে গুলজারবাগে প্রার্থনা সভা হ'ল। ঐদিন প্রার্থনার শেষে তিনি বললেন—হিন্দুরা মুসলমানদের প্রতি এমন সহৃদয় ব্যবহার করুন, যার ফলে এই সৌহার্দ্যের চুম্বক শক্তিতে তারা গ্রামে আবার ফিরে আসে। বিহারের হিন্দুরা উন্মত্ত হ'য়ে এখানের মুসলমানদের প্রতি যে অন্যায় ব্যবহার করেছে, তার জন্য তাদের আশ্রয়প্রার্থী শিবিরে গিয়ে মুসলমানদের সান্ত্বনা দেওয়া উচিত এবং আশ্রয়প্রার্থীদের সুখসুবিধার বিধান করা কর্তব্য; তাহলে তাদের অন্যায়ের কতকটা পরিশোধ হবে।

এইদিন মহাত্মা গান্ধী আত্মনির্ভরশীলতার নীতিতে আশ্রয়প্রার্থী-

শিবির পরিচালিত হওয়ায়, তার প্রশংসা করলেন। তিনি বললেন—মানুষ কাজ করে এবং তার জন্য উপযুক্ত মজুরি পায়। এইরূপ আত্মনির্ভরশীলতা হতেই আত্মসম্মান জ্ঞান জন্মে।

১৯শে তারিখে পাটনা হতে ৪০ মাইল দূরে বাঢ়ে, ২০শে প্রায় ২৬ মাইল দূরে হিলসায়, ২১শে ৩০ মাইল দূরে বিক্রম নামক গ্রামে ও ২২শে ১৬ মাইল দূরে ফতেপুর গ্রামে প্রার্থনা সভার অনুষ্ঠান হ'ল। প্রার্থনা সভায় প্রতিদিনই তিনি হিন্দুমুসলমান মিলনের কথা বললেন। ২২শে তারিখে বিশেষ ক'রে হিন্দু মহিলাদের লক্ষ্য ক'রে তিনি বললেন—সৌভাগ্যের বিষয় হিন্দুমহিলাদের অধিকাংশই মুসলমান মহিলাদের মতন পর্দা মানেন না। তাঁদের উচিত মুসলমান ভগিনীদের সঙ্গে অবাধে মেলামেশা করা এবং তাদের দুঃখ কষ্টের সমভাগিনী হওয়া।

এর পর ২৪শে মে তারিখে মহাত্মা গান্ধী কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সভায় যোগদান করবার জন্য ও বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের ৩রা জুনের ঘোষণা সম্বন্ধে নেতৃবৃন্দের সঙ্গে আলোচনা করবার জন্য পাটনা ত্যাগ ক'রে নয়াদিল্লী গেলেন।

# কলকাতায়

১৫ই আগষ্টের অব্যবহিত কয়েকদিন পূর্বেকার কথা। ভারতবর্ষ ও পাকিস্থান দুইটি রাষ্ট্রই স্বাধীনতা সমাগমে আনন্দমত্ত ও উৎসবমুখর। একদিকে রাজনৈতিক চেতনা, অপরদিকে সাম্প্রদায়িক হানাহানির কারণে বিভক্ত ভারতের উভয় অংশেই সমাজের অতি নিম্নস্তর পর্যন্তও এর আহ্বান গিয়ে পৌঁছেছে। পাকিস্থানে বিশেষ ক'রে পূর্ব-পাকিস্থানের হিন্দুরা কেবল এই উৎসব আহ্বানে সাড়া দিতে পারছে না। ১৫ই আগষ্টের আগমনে তারা নিরানন্দ, ভীত, সন্ত্রস্ত ও উদ্বিগ্ন। কারণ বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের ৩রা জুনের ঘোষণায় লীগের পাকিস্থান দাবী স্বীকার ক'রে নেওয়া হ'লে, তখন থেকেই পূর্ববঙ্গের মুসলমানরা প্রতিবেশী হিন্দুদের সহিত এরূপ আচরণ ক'রতে আরম্ভ করে, যার ফলে ১৫ই আগষ্ট নিকটবর্তী হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে হিন্দুদের ভয় ও আশঙ্কা আরও বৃদ্ধি পেতে থাকে। ইতিমধ্যে মুসলমানরা হিন্দু প্রতিবেশীদের পাকিস্থান এলে তাদের সঙ্গে বৈবাহিক সম্পর্কে আবদ্ধ হ'তে হবে, একথা জানিয়ে দিয়েছে। পাকিস্থান প্রতিষ্ঠিত হবার পূর্বেই হিন্দুরা মৃতদেহ দাহ ক'রতে গিয়ে কোথাও কোথাও বাধা পেয়েছে এবং পাকিস্থান পাকাপাকি হ'য়ে গেলে, হিন্দুদের মৃতদেহ দাহ না ক'রে কবর দিতে হবে, একথাও কেহ কেহ ঘোষণা করেছে। প্রকাশ্য দিবালোকে মুসলমান যুবকদের অভদ্র ইঙ্গিতে বয়স্কা হিন্দু ছাত্রীরা স্কুল যাওয়া বন্ধ করতে বাধ্য হয়েছে। হিন্দুরা দলে দলে পূর্ববঙ্গ ত্যাগ ক'রে পশ্চিম বাঙ্গলার দিকে চলে আসছে।

পূর্ববঙ্গের যখন এইরূপ অবস্থা, যখন তারা নোয়াখালির পুনরাবি-

র্ভাবের আশঙ্কায় শঙ্কিত তখন জাতীয় নেতারা অত্যন্ত চিন্তিত হ'যে পড়লেন। বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির পক্ষ থেকে পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন জেলার নেতাদের স্ব স্ব জেলায় গিয়ে হিন্দুদের অভয় দেবার কথা জানান হ'ল। কেহ কেহ পূর্ববঙ্গের সমস্ত প্রবাসী যুবক ও প্রৌঢ়কে ১৫ই আগষ্টের কয়েকদিন পূর্বে ও পরে নিজ নিজ গ্রামে গিয়ে বাস করবার কথাও জানালেন।

দুর্গত-বন্ধু মহাত্মা গান্ধী এই সময়ে ছিলেন নয়াদিল্লী হ'তে কাশ্মীরে। মৌলানা আজাদের প্রতিশ্রুতি রক্ষার জন্ম তিনি কাশ্মীরে গিয়েছেন। তিনি স্থির করলেন, কাশ্মীর ভ্রমণের পর স্বাধীনতা দিবসে আনন্দ করবার জন্ম নয়াদিল্লী তাঁর স্থান নয়, পূর্ব বাঙ্গলার উপক্রুত অঞ্চলই হ'ল তাঁর যোগ্য স্থান। তাই তিনি ভারতের সুদূর একপ্রান্তে কাশ্মীর হ'তে অপরপ্রান্তে নোয়াখালির পথে যাত্রা করলেন। ৯ই আগষ্ট প্রাতে তিনি সোদপুরে এসে পৌঁছলেন।

মহাত্মাজী স্থির করেছিলেন, মাত্র একদিন সোদপুরে অবস্থান ক'রেই তিনি পূর্ববাঙ্গলায় যাত্রা করবেন কিন্তু সোদপুরে এসে তাঁর সে সঙ্কল্প ওলট পালট হ'য়ে গেল। কলকাতায় এই সময়ে আবার হিন্দু মুসলমানের দাঙ্গা চরম আকার ধারণ করলে, তিনি বিশেষ উদ্বিগ্ন হ'য়ে পড়লেন। নোয়াখালি যাত্রা তাঁর স্থগিত হয়ে গেল।

ইতিপূর্বে মহাত্মা গান্ধী নভেম্বর মাসে ( ১৯৪৬ ) নোয়াখালি যাওয়ার সময় সোদপুরে কয়েকদিন অবস্থান ক'রে কলকাতায় শান্তি স্থাপনের জন্ম বাঙ্গলার গবর্ণর ও তাঁর মন্ত্রীদের সঙ্গে আলোচনা ক'রে, তাঁদের উপদেশ দিয়ে গিয়েছিলেন। অবশ্য তারপর থেকে কলকাতায় সম্পূর্ণরূপে নিরাপত্তার ভাব ফিরে না এলেও এবং গণ্ডগোল একেবারে দূরীভূত না হ'লেও, কলকাতার অবস্থা এক প্রকার শান্তই ছিল। তবে এপ্রিল মাসে (১৯৪৭) আবার একবার কলকাতায় হাঙ্গামা দেখা দেয়। এই সময়

মহাত্মা গান্ধী দেশের রাজনৈতিক অবস্থার পরিবর্তনে বড়লাট ও কংগ্রেস নেতাদের উপদেশ দেবার জন্য নয়াদিল্লীতে অবস্থান করছিলেন। বাঙ্গলার একটি প্রতিনিধিদল নয়াদিল্লীতে মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে সাক্ষাৎ ক'রে কলকাতার হাঙ্গামার কথা তাঁকে জানালে, তিনি নয়াদিল্লীর কাজ শেষ ক'রে ৯ই মে একেবারে কলকাতায় চলে এলেন এবং খাদি প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র দাসগুপ্ত তাঁর নির্দেশ অনুযায়ী পূর্ব বাঙ্গলায় উপদ্রুত অঞ্চলসমূহে সেবাকাজ চালিয়ে যেতে থাকায়, তিনি সোদপুর খাদি প্রতিষ্ঠান আশ্রমে এসে সতীশ বাবুর ভ্রাতা শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র দাসগুপ্তের আতিথ্য গ্রহণ করলেন। এই সময় বাঙ্গলার প্রধান মন্ত্রী মিঃ সুরাবর্দী কলকাতায় ছিলেন না, তাই মহাত্মাজী অর্থসচিব মহম্মদ আলিকে নিয়ে কলকাতার দাঙ্গা বিধ্বস্ত অঞ্চল পরিদর্শন করলেন। কলকাতায় তাঁর উপস্থিতিতে হাঙ্গামার অবস্থা শান্ত হ'য়ে এলে, এখানে মাত্র ৬ দিন অবস্থান ক'রে তিনি বিহারে তাঁর আরব্ধ কাজ শেষ করবার জন্য বিহার যান।

কিন্তু কলকাতার এবারের এই হাঙ্গামায় মহাত্মা গান্ধী অত্যন্ত বিচলিত হ'য়ে পড়লেন। বাঙ্গলার প্রধান মন্ত্রী মিঃ সুরাবর্দী এবং পশ্চিম বঙ্গের ছায়া-মন্ত্রীসভার প্রধান মন্ত্রী ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষের সঙ্গে এ সম্পর্কে তিনি আলোচনা চালাতে লাগলেন এবং ১১ই আগষ্ট তিনি কলকাতার বিভিন্ন উপদ্রুত অঞ্চল দেখে এলেন। অবশেষে তিনি ঐদিন সন্ধ্যায় মিঃ সুরাবর্দীর নিকটে প্রস্তাব করলেন—কলকাতার দাঙ্গা নিবারণের জন্য আসুন আমরা উভয়ে একসঙ্গে শান্তি-অভিযানে বাহির হই, বিধ্বস্ত অঞ্চলের কোনও একটি পরিত্যক্ত গৃহে আমরা উভয়ে একই কামরায় বাস করব। দু'জনেই একসঙ্গে দুর্গত হিন্দু-মুসলমানের দুঃখের কাহিনী শুনব।
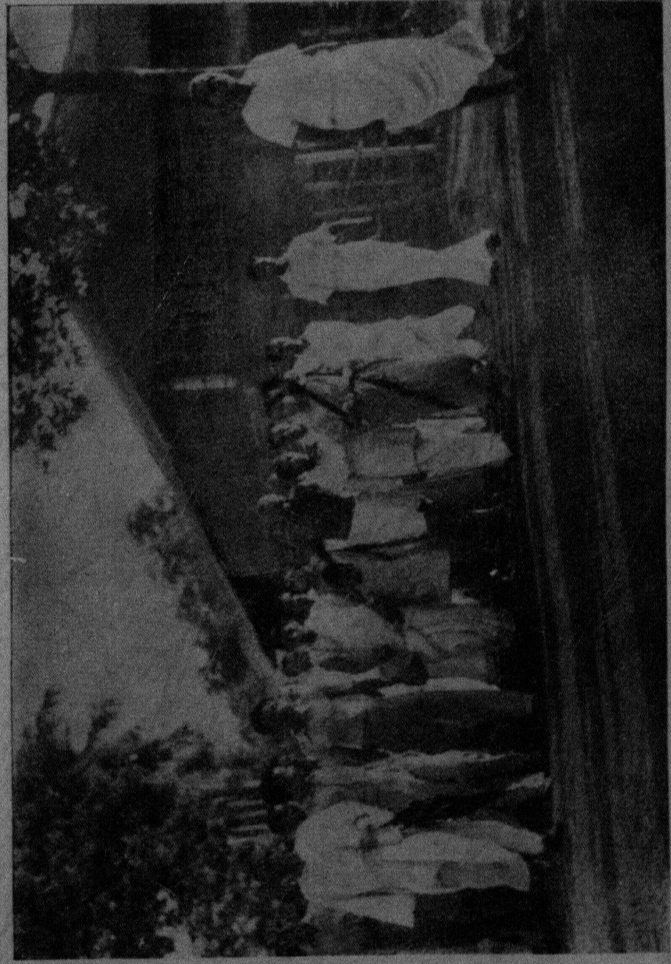
সোদপুর খাদি-প্রতিষ্ঠান আশ্রমে মহাত্মা গান্ধী ; ডানদিকে সম্মুখে শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র দাসগুপ্ত, তাঁর পশ্চাতে খাদি-প্রতিষ্ঠানের জনৈক কর্মী, তাঁর পশ্চাতে এই গ্রন্থের লেখক ।

প্রস্তাবটি মিঃ সুরাবর্দীর নিকটে এমনি গুরুত্বপূর্ণ ছিল যে, তিনি সঙ্গে সঙ্গে তার কোনও উত্তর দিতে পারলেন না। শেষে তিনি মহাত্মা গান্ধীর উপদেশ অনুযায়ী তাঁর বৃদ্ধ পিতা ও কন্যার সঙ্গে পরামর্শ ক'রে পরদিন মহাত্মাজীর প্রস্তাবে সম্মতি জানালেন।

১৩ই আগষ্ট রাত্রিতে মহাত্মা গান্ধী সোদপুর ত্যাগ ক'রে কলকাতার বেলেঘাটা অঞ্চলের একটি মুসলমানের বাড়ীতে এসে বাস করতে আরম্ভ করলেন। তাঁর দলবল সমস্তই সোদপুরে রেখে এলেন। মাত্র তাঁর সেক্রেটারী অধ্যাপক নির্মলকুমার বসু, শ্রীযুক্তা আভা গান্ধী ও কুমারী মনু গান্ধীকে সঙ্গে নিলেন। মিঃ সুরাবর্দীও এসে মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে একই কামরায় বাস করতে লাগলেন। বেলেঘাটার ঐ স্থানটি হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের দ্বারাই অধ্যুষিত ছিল।

বেলেঘাটার হিন্দু অধিবাসীরা মিঃ সুরাবর্দীকে নিয়ে এইরূপ শান্তি-অভিযানে বাহির হওয়ায়, মহাত্মা গান্ধীর উপরে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল। লীগের প্রত্যক্ষ-সংগ্রামে যে সুরাবর্দী কলকাতা তথা বাঙ্গলার হত্যা-যজ্ঞের প্রধান হোতা, তাঁকে সঙ্গে ক'রে শান্তি-অভিযানে বাহির হওয়ায় হিন্দুরা তা সহ্য করতে পারল না। মিঃ সুরাবর্দীর উপরে বাঙ্গলার হিন্দু সমাজের যে ক্রোধ তা ক্ষমাহীন, কারণ তাদের ধন, ধর্ম, মান, প্রাণ বহুলাংশে নষ্ট হয় তাঁরই হাতে। তারা এঁকে গদিচ্যুত করবার চেষ্টা করেছে বহুবার; তাঁর বিরুদ্ধে নালিশ ক'রে বিচারও চেয়েছে অসংখ্যবার।

হেন মিঃ সুরাবর্দীকে সঙ্গী ক'রে মহাত্মা গান্ধী বেলেঘাটায় বেরুলে স্থানীয় হিন্দু অধিবাসীরা মহাত্মা গান্ধীর প্রতি ক্রোধ ও বিক্ষোভ প্রদর্শন করতে লাগল, এমন কি তাঁকে সে স্থান থেকে ফিরে যাবার কথাও বলা হ'ল। এই সময় অবশ্য বাঙ্গলার লীগ

মন্ত্রীসভার প্রতিপক্ষ হিসাবে পশ্চিম বাঙ্গলায় একটি ছায়া মন্ত্রীমণ্ডলী খাড়া ক'রে দেওয়ায়, হিন্দুরা যেমন একদিকে অনেকটা সাহস পেয়েছিল, অপরদিকে কলকাতা পাকিস্থানের বাইরে চ'লে যাওয়ার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা থাকায় কলকাতায় লীগের দাপটও চুরমার হয়ে গিয়েছিল।

যাই হোক মহাত্মা গান্ধী, যিনি আপন কর্তব্যে স্থির ও অটল, তিনি কারও বিক্ষোভে ও ক্রোধ প্রকাশে বিচলিত হলেন না। "অবিশ্বাসী" "অত্যাচারী" সুরাবর্দীকেই তিনি কলকাতার শান্তি-অভিযানে সঙ্গী করলেন এবং হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে সকলের নিকটেই শান্তি ও মিলনের বাণী নিয়ে অগ্রসর হলেন।

ইতিপূর্বে বাঙ্গলার প্রাদেশিক মুসলিম লীগ ও কলকাতা সিটি মুসলিম লীগের পক্ষ হতে ঘোষণা করা হয়েছিল যে, কলকাতার মুসলমানরা ১৫ই আগষ্ট তারিখে স্বাধীনতা-উৎসব সর্বপ্রকারে বর্জন ক'রে, শোক-দিবস পালন করবে। কিন্তু মহাত্মা গান্ধীর এই শান্তি-অভিযানের ফলে মুহূর্তের মধ্যেই যেন এক যাদু খেলে গেল। যে লীগ প্রত্যক্ষ-সংগ্রাম করেছে এবং স্বাধীনতা দিবসে শোক প্রকাশ করবার সিদ্ধান্ত করেছে, তার মতি গেল ঘুরে। প্রাদেশিক মুসলিম লীগ, কলকাতা সিটি মুসলিম লীগ ও মিঃ সুরাবর্দী কলকাতার মুসলমানদের নিকটে আবেদন ক'রে জানালেন যে, তারা যেন কলকাতার হিন্দুদের সঙ্গে সর্বতোভাবে স্বাধীনতা উৎসবে যোগদান করে এবং নিজ নিজ বাসভবনে ভারতের জাতীয় পতাকা উত্তোলন করে।

এই আবেদনের পর ১৪ই আগষ্ট অপরাহ্নে দেখা গেল—মুসলমানরা নিজেদের পল্লীতে পল্লীতে স্বাধীনতা দিবস পালনের জন্য উৎসবের আয়োজন সুরু ক'রে দিয়েছে। কোথাও কোথাও মুসলমানরা সাহসে ভর ক'রে হিন্দুদের সঙ্গে মিলিত হয়ে, বড় বড় রাস্তার উপরে তোরণ বাঁধতে আরম্ভ

করেছে। মুসলমানরা এলে হিন্দুরা তাদের সাদরে গ্রহণ করল। একটি বর্ষব্যাপী হানাহানির পর হিন্দু-মুসলমান এই প্রথম পাশাপাশি দাঁড়াল। একটি বৎসর ধ'রে হিন্দু-মুসলমান দুটি সম্প্রদায় কেহ কা'কেও বিশ্বাস করত না, কেহ কারও পাড়ায় যেতে পারত না। সুযোগ পেলেই একে অপরকে হত্যা করছিল। ভারতের স্বাধীনতা লাভের শুভমুহূর্তে মহাত্মা গান্ধীর প্রচেষ্টায় এক অভাবনীয় ঘটনা ঘটে গেল। কলকাতাবাসী হিন্দু-মুসলমান বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে পড়ল; পুলকিত হৃদয়ে পরস্পর মিলিত হ'ল।

১৫ই আগষ্ট স্বাধীনতা দিবসে মহাত্মা গান্ধী জনসাধারণের মঙ্গলের জন্য দেশবাসীকে উপবাস ও প্রার্থনা করতে উপদেশ দিলেন। মিঃ সুরাবর্দী ও কলকাতার ভূতপূর্ব মেয়র মিঃ ওসমান মহাত্মার উপদেশ মত উপবাস করলেন। এই দেখে দেশবাসী আরও বিস্মিত হয়ে গেল এবং যে সুরাবর্দী ও ওসমানকে হিন্দুরা কলকাতার হত্যাকাণ্ডের জন্য প্রধানত দায়ী করে, মহাত্মা গান্ধীর সংস্পর্শে এসে তাঁদের এই পরিবর্তনে প্রায় ৫০০ শত বৎসর পূর্বে নবদ্বীপধামে শ্রীমন্ মহাপ্রভু প্রেমের দ্বারায় যেমন জগাই মাধাইকে জয় করেছিলেন, তারই কথা মনে করিয়ে দিল। বেলেঘাটার হিন্দুরা, যারা মিঃ সুরাবর্দীকে সঙ্গে নেওয়ায় মহাত্মার প্রতি বিক্ষোভ প্রদর্শন করেছিল, তারাও মহাত্মার প্রতি শ্রদ্ধায় মাথা নত করল।

স্বাধীনতা উৎসবের পরই এই সময়ে মুসলমানদের ঈদ-পর্ব ছিল। মুসলমানরা ফল, মিষ্টান্ন প্রভৃতি প্রতিবেশী হিন্দুদের উপহার পাঠাতে লাগল। হিন্দুরা সাদরে সে সব গ্রহণ করল এবং তারাও মুসলমানদের বাড়ীতে মিষ্টান্নাদি পাঠাল। কলাবাগান, মেছুয়াবাজার, রাজাবাজার, ইণ্টালী, ধর্মতলা, চীৎপুর প্রভৃতি মুসলমান প্রধান অঞ্চলে লীগ-শাসন

আমলে একটি বৎসর যেখানে হিন্দু হত্যা চলেছে এবং ট্রাম, বাস প্রভৃতি যানবাহন যখনই ঐ সকল অঞ্চল দিয়ে যাতায়াত করেছে, তখন তাদের উপরে এসিড, বোমা ও গুলি নিক্ষিপ্ত হয়েছে। এখন ঐ সকল স্থানে মুসলমানরা পথের উপর দাঁড়িয়ে আতর, গোলাপজল প্রভৃতি পিচকারীতে ভ'রে ট্রাম ও বাসের যাত্রীদের উপরে নিক্ষেপ করতে লাগল। সমগ্র শহরব্যাপী এক অভূতপূর্ব মিলনের সাড়া প'ড়ে গেল। দেশবাসী ইতিপূর্বে বোধহয় আর কোনও দিন এরূপ মিলন দেখে নি। হিন্দু-অধ্যুসিত অঞ্চলে মুসলমানদের এবং মুসলমানপ্রধান অঞ্চলে হিন্দুদের ফিরিয়ে আনবার জন্য সর্বত্রই শান্তি কমিটি গঠিত হয়ে গেল এবং দীর্ঘ এক বৎসরকাল পরে হিন্দু-মুসলমান প্রত্যেকেই তাদের নিজ নিজ বাড়ীতে ফিরে আসতে লাগল।

মুসলমান-অধ্যুসিত চীৎপুরের যে নাখোদা মসজিদকে দাঙ্গার সময়ে হিন্দুরা মুসলমানদের একটা মস্ত বড় ঘাঁটি ও দুর্গ ব'লে ভেবে আসছিল এবং যাকে ঘিরে হিন্দুরা কত দুর্ভাবনার সৃষ্টি করেছিল, সেটা কত বড় ও কিরূপ কৌতুহলবশে তা দেখবার জন্য ঈদের সময়ে হিন্দুদের ভীড় জমে গেল। এমন কি কলকাতার বহু মহিলাও তা দেখে এল। মুসলমানরা হিন্দুদের আদর ক'রে মসজিদ দেখাল, মিষ্টান্ন বিতরণ করল এবং হিন্দু-মুসলমান পরস্পর পরস্পরকে আলিঙ্গন করল। উভয়েই মুখে বলল—মহাত্মা গান্ধীর দয়ায় আজ অভাবনীয় ঘটনা ঘটেছে, আর আমাদের মধ্যে কোন বাদবিসম্বাদ নেই। আমরা হিন্দু-মুসলমান আজ এক, আমরা ভাই ভাই।

এদিকে মহাত্মা গান্ধীর বেলেঘাটার বাসভবন হিন্দু-মুসলমানের এক তীর্থস্থানে পরিণত হ'ল। কলকাতার হিন্দু-মুসলমান জনসাধারণ কয়েকদিন ধ'রে যেন বেলেঘাটায় ভেঙ্গে পড়ল। মহাত্মা গান্ধীর

দর্শনের আকাঙ্ক্ষায় দলে দলে লোকে বেলেঘাটার দিকে চলল এবং সকাল হ'তে অধিক রাত্রি পর্যন্তও এই জনস্রোত মোটেই কমল না। মহাত্মা গান্ধী গৃহের বাইরে এসে বারে বারে দর্শনার্থীদের দর্শন দিতে লাগলেন।

এই সময় শহর, শহরতলী, এমন কি কলকাতা হ'তে বহু দূরে দূরেও মহাত্মার প্রার্থনা সভার অনুষ্ঠান হ'তে লাগল। নারকেলডাঙ্গা, মোহমেডান স্পোর্টিং গ্রাউণ্ড, সরকারবাগান, পোলক ষ্ট্রীট ময়দান, পার্ক সার্কাস, দেশবন্ধু পার্ক, আলিপুর, গড়েরমাঠ, হাওড়া ময়দান, বালিগঞ্জ লেক ময়দান, মেটে বুরুজ, ইউনিভারসিটি সায়েন্স কলেজ প্রাঙ্গণ, টালিগঞ্জ পুলিশ লাইন, বারাসত, বাগমারী ময়দান এই সকল স্থানে যথাক্রমে ১৭ই আগষ্ট থেকে ৩১শে পর্যন্ত মহাত্মা গান্ধীর প্রার্থনা সভা হ'ল। প্রায় প্রতিদিনই তাঁর প্রার্থনা সভায় লক্ষ লক্ষ লোক যোগ দিল। তারা কোনদিন প্রখর সূর্যের তাপে পুড়ে, আবার কোনদিন বৃষ্টির জলে ভিজে মহাত্মার উপদেশ শুনল। মহাত্মা গান্ধী প্রতিদিনই কলকাতার এই মিলন সৌহার্দ্যকে দৃঢ় ও অটুট করবার উপদেশ দিতে লাগলেন। মিঃ সুরাবর্দীও হিন্দু-মুসলমান মিলনের জন্য প্রার্থনা সভায় বক্তৃতা করলেন। মহাত্মা গান্ধীকে প্রকৃতই মহাত্মা বুঝতে পেরে, তিনি যে তাঁর পায়ের নিকটে আশ্রয় নিয়েছেন, একথা তিনি মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করলেন।

মহাত্মা গান্ধীর শান্তি-অভিযানের ফলে এক বৎসর পরে কলকাতায় পুনরায় শান্তি ফিরে এল। কলকাতাবাসী হিন্দু-মুসলমান স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচল। ক'দিন পূর্ব পর্যন্তও যে, কলকাতার বুকের উপর ধ্বংসকাণ্ড ঘটে গিয়েছে, লোকে যেন তা ভুলে গেল। হিন্দু ও মুসলমানের মন থেকে অবিশ্বাসের ভাব একেবারে উড়ে গেল। প্রত্যক্ষ-

সংগ্রামের পূর্বে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে যে সদ্ভাব ছিল, ঠিক তেমনটিই ফিরে এল।

এই সময়ে মহাত্মা গান্ধীর সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত পিয়ারীলাল ও খাদি প্রতিষ্ঠানের কর্মী শ্রীযুক্ত চারুভূষণ চৌধুরী নোয়াখালির সেবাকেন্দ্র হ'তে কলকাতায় এসে মহাত্মাকে নোয়াখালির অবস্থা জানালে, ২রা সেপ্টেম্বর মহাত্মা গান্ধী কয়েক দিনের জন্য একবার নোয়াখালি যাওয়া স্থির করলেন।

কিন্তু কলকাতার এই মিলন স্রোতের মধ্যে ৩১শে আগষ্ট তারিখে একদল লোক পুনরায় একটা গণ্ডগোল পাকাবার চেষ্টা করল। মুসলমানগণ কর্তৃক ছুরিকাহত হয়েছে এইরূপ মিথ্যা কথা ব'লে (কারণ তাদের কথামত তাদের পরীক্ষা করা হ'লে, তারা কোনও ছুরিকাঘাতের চিহ্ন দেখাতে পারল না) মহাত্মার বেলেঘাটার বাসভবনে গিয়ে উপদ্রবের সৃষ্টি করল। তারা মহাত্মার প্রতি ক্রোধ ও যথেষ্ট অসৌজন্য প্রকাশ করতেও কুণ্ঠিত হ'ল না।

পরদিন মধ্যাহ্ন হতে শহরে পুনরায় হাঙ্গামা সুরু হ'য়ে গেল। হিন্দু-মুসলমান পরস্পরের মধ্যে বিশ্বাস ফিরে আসায় নিশ্চিন্ত মনে একে অপরের পাড়ায় গিয়েছিল। ফলে এই দিন অতর্কিত হাঙ্গামার কারণে অনেকেই হতাহত হ'ল। প্রায় ৫০ জন নিহত ও ৩০০ জন আহত হ'ল।

মহাত্মা গান্ধী এই সংবাদে অত্যন্ত মর্মাহত হয়ে পড়লেন। তিনি দেখলেন—কলকাতায় মিলন-বুদ্বুদ ফেঁসে গেছে। কলকাতা তাঁর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। তাই তিনি মুখের কথা অপেক্ষা তাঁর
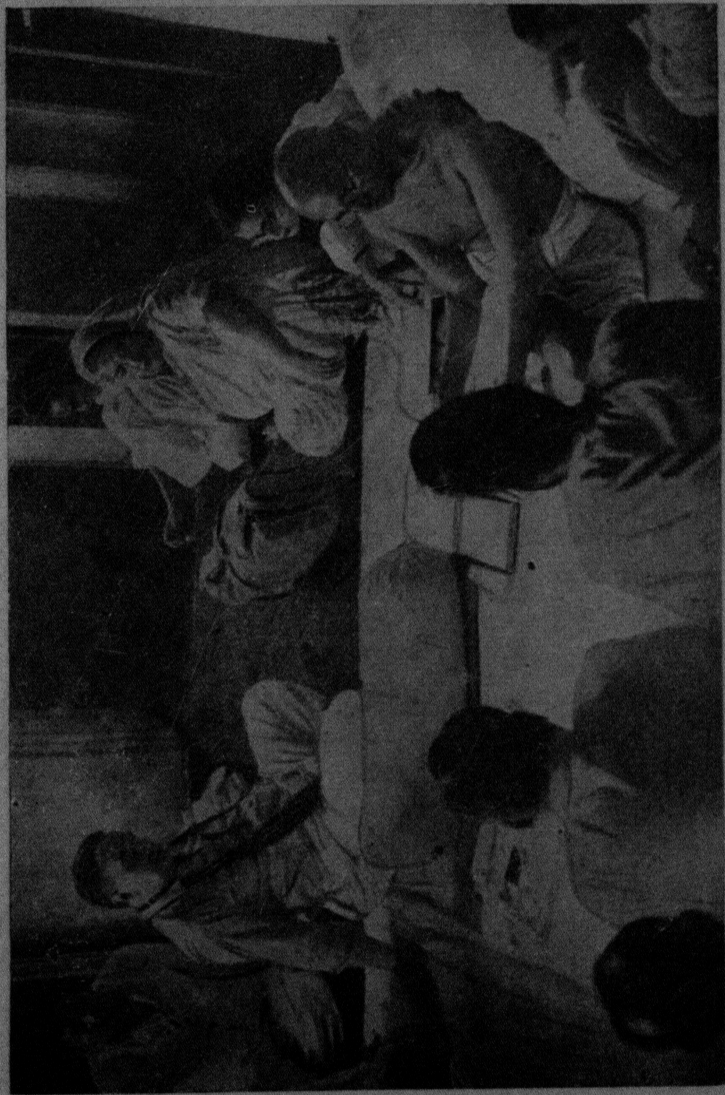
বেলেঘাটায় শান্তি-স্থাপনে মহাত্মা গান্ধী ; মহাত্মার সম্মুখে মিঃ সুরাবর্দী ।

শক্তিশালী অস্ত্র অনশন ধরলেন। ১লা সেপ্টেম্বর রাত্রি ৮-১৫ মিঃ থেকে তিনি অনশন আরম্ভ করলেন। এ সম্পর্কে তিনি জানালেন— যতদিন না কলকাতায় এই অবস্থার পুনরায় প্রকৃত পরিবর্তন হচ্ছে, ততদিন আমি অনশন ত্যাগ করব না। হিন্দু-মুসলমান পরস্পরের মধ্যে এইরূপ হানাহানি দেখা অপেক্ষা মৃত্যুই আমার পক্ষে শ্রেয় ব'লে মনে করি।

মহাত্মা গান্ধীর অনশন আরম্ভের সঙ্গে সঙ্গেই সমগ্র কলকাতা একেবারে চঞ্চল হয়ে উঠল। বাঙ্গলা সরকারের সঙ্গে, হিন্দু-মুসলমান উভয় দলেরই সকল নেতা, উপনেতা, ছাত্র, কেরাণী, শ্রমিক প্রভৃতি সকলেই শান্তি স্থাপনে আগিয়ে এলেন। উপদ্রুত অঞ্চলে শান্তি-শোভাযাত্রা বেরুল। এই শোভাযাত্রার নেতৃত্ব করতে গিয়ে শচীন মিত্র, স্মৃতীশ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি কয়েকজন বিশিষ্ট কংগ্রেস-কর্মী প্রাণ হারালেন।

সকলের সমবেত চেষ্টায় অবশেষে কলকাতায় পুনরায় শান্তি ফিরে এল। শান্তি ফিরে আসায় এবং এই শান্তিকে বজায় রাখবার দায়িত্ব গ্রহণ ক'রে কলকাতার বিভিন্ন সম্প্রদায়ের নেতৃবৃন্দ এক প্রতিশ্রুতি পত্রে স্বাক্ষর করলে, মহাত্মা গান্ধী ৪ঠা সেপ্টেম্বর রাত্রি ৯-১৫ মিনিটের সময় অনশন ভঙ্গ করলেন।

মহাত্মার অনশন ভঙ্গের পূর্বে হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়েরই অনেকে তাদের নিকটে যে সকল বে-আইনী অস্ত্রশস্ত্র ছিল, সেইগুলো তাঁর কাছে সমর্পণ ক'রে, শান্তি অব্যাহত রাখবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে এল। পরদিন আরও অনেকেই অস্ত্রশস্ত্র ফেরৎ দিল। মহাত্মা গান্ধী তাদের দেশে শান্তি স্থাপনে অগ্রসর হতে উপদেশ দিলেন এবং তারাও তাতে সম্মত হ'ল।

এইভাবে পুনরায় কলকাতায় এক অটুট শান্তি ফিরে এল। কিন্তু মহাত্মা গান্ধী কলকাতায় আর অপেক্ষা করতে পারলেন না। কারণ ১৪ই আগষ্ট মধ্যরাত্রি থেকে বিভক্ত পাঞ্জাবের উভয় অংশেই সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ঘোরতররূপে দেখা দেয়। পশ্চিম পাঞ্জাবের সংখ্যাগুরু মুসলমানরা সেখানকার হিন্দু ও শিখ নিধনে এবং পূর্ব পাঞ্জাবে হিন্দু ও শিখরা সংখ্যালঘু মুসলমান হত্যায় মত্ত হয়ে ওঠে। মহাত্মা গান্ধী এই সংবাদে অত্যন্ত মর্মাহত ও উদ্বিগ্ন হয়ে পড়লেন। তাই তিনি তাঁর নোয়াখালি যাওয়ার প্রস্তাব ত্যাগ ক'রে, ৭ই সেপ্টেম্বর সন্ধ্যায় পাঞ্জাবের দুর্গত জনসাধারণের সেবার জন্য কলকাতা ত্যাগ করলেন।

# দিল্লী শহরে

১৪ই আগষ্ট মধ্য রাত্রিতে যখন এক পরম শুভ মুহূর্তে বিভক্ত ভারত বিপুল উৎসব আয়োজন সহকারে নবলব্ধ স্বাধীনতাকে বরণ ক'রে নিচ্ছিল, যখন রাত্রির গাঢ় অন্ধকার বিদূরিত হ'য়ে আলোকচ্ছটায় সমগ্র ভারত উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠছিল এবং শহর ও পল্লীর ঘরে ঘরে লোকের আনন্দ উল্লাসের সঙ্গে শুভ শঙ্খ-ঘণ্টা-ধ্বনি মিলিত হ'য়ে ভারতের আকাশ-বাতাস মুখরিত করছিল, সেই সময়ে দ্বিধা-বিভক্ত পাঞ্জাবের জনসাধারণ শুধু এই আনন্দোৎসবে যোগদান করতে পারল না। তাই ব'লে সেদিন ঐ গভীর রজনীতে সেখানে অন্ধকারও ছিল না, বা লোকে নীরবও ছিল না। সেখানে আলোও জ্বলেছিল এবং লোকের কণ্ঠধ্বনিও উঠেছিল। তবে সে আলো দুর্বৃত্তজনের হাতে থেকে প্রলয়ঙ্করী অগ্নিরূপে এক গৃহ হতে অপর গৃহে ছুটে, লোকের কত শত পুরুষের প্রিয় বাসভূমিকে পুড়িয়ে শ্মশানে পরিণত করেছিল। আর মানুষের যে আকুল কণ্ঠধ্বনি শোনা গিয়েছিল, প্রাণভিক্ষায় সে আর্তকণ্ঠ পাষাণকে গলাতে সক্ষম হলেও, সেদিনের সে দুর্বৃত্তদের মনকে আদৌ দ্রবীভূত করতে পেরেছিল না।

১৪ই আগষ্ট তারিখের মধ্য রাত্রি পর্যন্ত পাঞ্জাবে বৃটিশ শাসনের যে ৯৩ ধারার বাঁধন ছিল, যে মুহূর্তে তা টুটে গেল, অমনি বিভক্ত পাঞ্জাবের উভয় অংশেই বাধাপ্রাপ্ত, রুদ্ধ, প্রতিশোধপরায়ণ উন্মত্ত সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের জনগণ উদ্বেলিত মহাসমুদ্রের প্রলয়োচ্ছ্বাসের মত সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের উপরে নির্বিচারে ঝাঁপিয়ে পড়ল। যে আক্রমণের পশ্চাতে

কোন যুক্তি নেই, কোন সমর্থন নেই, কোন সদ্-বিবেচনা নেই—শুধু এক সম্প্রদায়ের লোকে অপর সম্প্রদায়ের দ্বারা নির্যাতীত হয়েছে, এইমাত্র ক্ষীণ অজুহাতেই এই ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞ সুরু হয়ে গেল। একদিকে প্রতিশোধপরায়ণ ক্ষিপ্ত জনগণ, অপরদিকে বিভক্ত পাঞ্জাবের উভয় অংশেই সদ্যজাত গবর্ণমেণ্ট। এই নবজাত গবর্ণমেণ্ট নিজ নিজ ক্ষমতা বুঝে নিতে না নিতেই, এক প্রকার বাধাহীনভাবে উভয় অংশেই দু'দিন ধ'রে হত্যাকাণ্ড চলল।

এই নারকীয় কাণ্ড দেখে, অবশেষে ভারত ও পাকিস্থান উভয় রাষ্ট্রের কর্ণধারগণ শান্তি ও শৃঙ্খলা স্থাপনের জন্য আগিয়ে এলেন। ১৭ই আগষ্ট প্রাতে পাকিস্থানের অন্তর্গত আম্বালা শহরে উভয় রাষ্ট্রের প্রতিনিধিবর্গের এক সম্মেলন বসল। তাতে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু, ভারতের দেশরক্ষা সচিব সর্দার বলদেব সিং ও সেনাবিভাগের সহকারী সর্বাধিনায়ক, কয়েকজন সহকর্মীসহ পাকিস্থানের প্রধানমন্ত্রী মিঃ লিয়াকৎ আলি খাঁ, পূর্ব ও পশ্চিম পাঞ্জাবের গবর্ণরদ্বয় ও তাঁদের মন্ত্রীবর্গ এবং উচ্চতম অফিসারগণ সম্মেলনে উপস্থিত থাকলেন। সম্মেলনে স্থির হ'ল যে, পূর্ব ও পশ্চিম পাঞ্জাবের উভয় অংশেই হানাহানি, লুণ্ঠন, অগ্নিসংযোগ ও অন্যান্য অপরাধ দমন করবার জন্য উভয় গবর্ণমেণ্টই অপক্ষপাত হয়ে কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করবেন এবং পাঞ্জাবের উভয় গবর্ণমেণ্ট ও উভয় কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্ট শরণাগত ও বাস্তুত্যাগীদের যথাসাধ্য সাহায্য করবেন।

এরপর হতেই আরম্ভ হ'ল শরণাগত ও বাস্তুত্যাগীদের এক বিরাট অভিযান। সে যে কি, তা কল্পনা করাও কঠিন। পাঞ্জাবের উভয় অংশ হ'তেই লক্ষ লক্ষ লোক সর্বস্ব ত্যাগ ক'রে শুধু প্রাণ নিয়ে পদব্রজে, ট্রেণে, বিমানে, মোটরে প্রভৃতিতে ক'রে নিরুদ্দেশের পথে যাত্রা করল।

ঠিক এই সময়ে মহাত্মা গান্ধী কলকাতায় বর্ষব্যাপী হিন্দু-মুসলমান হাঙ্গামার এক চূড়ান্ত সমাধান করবার জন্য ধ্যানে আত্মমগ্ন ছিলেন। দুর্গত পাঞ্জাব হতে আবার তাঁর ডাক এল। তিনি পাঞ্জাবের এই নিদারুণ সংবাদে অত্যন্ত মর্মাহত হয়ে পড়লেন এবং কলকাতার কাজ সমাধা ক'রেই পাঞ্জাব যাবার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠলেন।

ইতিমধ্যে পাঞ্জাবে যে লক্ষ লক্ষ আশ্রয়প্রার্থী বিনিময় হ'য়ে গেল, সেই সকল বাস্তুত্যাগী সর্বহারারদল নিরাপদ স্থানে পৌঁছে, আবার প্রতিশোধপরায়ণ হয়ে উঠল। ভারত হতে যে সব মুসলমান পাকিস্থানে চলে গেল, তারা সিন্ধু ও উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের অমুসলমানদের উপর হত্যা, লুণ্ঠন প্রভৃতি অত্যাচার সুরু করল। আর পশ্চিম পাঞ্জাবের বাস্তুত্যাগী, দিল্লীতে আশ্রয়প্রার্থী হিন্দু ও শিখগণ মিলিত হয়ে দিল্লীর মুসলমান নিধনে উন্মত্ত হয়ে উঠল। দিল্লীর অধিবাসীরাও অনেকেই এই নিধনযজ্ঞে যোগদান করল। ফলে ক'দিনেই সহস্রাধিক মুসলমান নিহত হ'ল।

মহাত্মা গান্ধী ঠিক এই সময়টিতে কলকাতায় হিন্দু-মুসলমান মিলনের এক অভূতপূর্ব যাদু দেখিয়ে পাঞ্জাবের পথে পাড়ি দিয়েছেন। পথে ৯ই সেপ্টেম্বর দিল্লীতে অবতরণ করেই তিনি যা শুনলেন ও দেখলেন, তাতে তিনি অত্যন্ত ব্যথিত হয়ে পড়লেন। পরদিন ১০ই সেপ্টেম্বর তারিখে দিল্লী শহরের প্রায় ৪০ মাইল পরিভ্রমণ ক'রে আশ্রয়প্রার্থী শিবিরগুলো পরিদর্শন করলেন এবং এক বিবৃতিদান প্রসঙ্গে তিনি জানালেন—দিল্লীবাসীরা তাদের উন্মত্ততা ত্যাগ ক'রে শান্ত না হওয়া পর্যন্ত আমি কোনমতেই পাঞ্জাব যাচ্ছি না। প্রতিশোধ কখনই প্রতিকার নয়। এতে আসল ব্যাধিই আরও দুরারোগ্য হয়ে উঠবে। যারা নির্বিচারে হত্যা, লুণ্ঠন, অগ্নিসংযোগ প্রভৃতি ব্যাপারে ব্যাপৃত, আমি

তাদের নিবৃত্ত হতে একান্ত অনুরোধ করছি। কলকাতা ত্যাগ করবার কালে এই শোচনীয় কাণ্ডের কিছুই আমি জানতাম না। এখানে আসা অবধি আমি কেবলই এখানকার করুণ কাহিনী শুনছি। কয়েকজন মুসলমান বন্ধু আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ ক'রে তাঁদের মর্মান্তিক কাহিনীর কথা বলছেন। দিল্লীর অবস্থা শান্ত করবার জন্য আমি "করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে" নীতির প্রয়োগ করব।

এই সময়ে রাজধানী দিল্লী নগরী যেন শ্মশানভূমে পরিণত হয়ে পড়েছিল। শহরের সর্বত্রই সান্ধ্য আইন। পথে যানবাহন ও লোকের নামগন্ধ নেই। সান্ধ্য আইনের কারণে মহাত্মার প্রার্থনাসভায় অতি অল্পসংখ্যক লোকই ঐদিন যোগদান করল। তিনি তাঁর প্রার্থনান্তিক ভাষণে বললেন—ভাঙ্গী কলোনীতে আমি যে বাড়ীতে বাস করতাম, সেখানে আশ্রয়প্রার্থীরা বাস করছে। সেই জন্য আমি বিড়লা ভবনে এসে উঠেছি। আশ্রয়প্রার্থীসমস্যা ব'লে কিছু থাকা, জাতি হিসাবে আমাদের পক্ষে একটা লজ্জার কথা।

এরপর মহাত্মা তাঁর আশ্রয়প্রার্থী-শিবিরসমূহ পরিদর্শনের কথা উত্থাপন করলেন। তিনি আশ্রয়প্রার্থীগণকে সততার সহিত ও নির্ভীকভাবে জীবনযাপন করতে বললেন এবং কেহ কারও প্রতি বিদ্বেষ বা ঘৃণা প্রকাশ না করবার জন্য অনুরোধ জানালেন।

এরপর থেকে মহাত্মা গান্ধী প্রায় প্রতিদিনই মুসলিম আশ্রয়প্রার্থী শিবিরগুলো পরিদর্শন করতে লাগলেন এবং শিবিরের সহস্র সহস্র দুর্গত মুসলমান নরনারী ও শিশুদের সান্ত্বনা দিয়ে বলতে লাগলেন—আমি আপনাদের সাহায্যের জন্যই দিল্লীতে রয়েছি এবং এ জন্য আমি আমার যথাসাধ্য চেষ্টা করছি। আপনাদের দুঃখে আমি বেদনা অনুভব করছি। দিল্লীতে যাতে মুসলমান ও অন্যান্য সম্প্রদায় পুনরায় সম্পূর্ণ শান্তিতে

বাস করতে পারে, আমি তার জন্য চেষ্টা করব। হয় আমি এই কাজে সফলকাম হব, নতুবা এই কাজ করতে করতেই আমি মৃত্যু বরণ করব।

মহাত্মা গান্ধী যখন শিবিরগুলো পরিদর্শন করতে থাকেন, তখন সেখানের মুসলিম আশ্রয়প্রার্থীরা সাশ্রু নয়নে করজোড়ে মহাত্মাকেই তাদের একমাত্র ত্রাণকর্তা ব'লে জানাতে লাগল। তারা তাঁর নিকটে তাদের দুঃখের কাহিনী ও অভাব অভিযোগের কথা বলল। তারা মহাত্মাকে অন্নবস্ত্র দেবার জন্য এবং স্বাস্থ্যকর স্থানে তাদের রাখবার জন্য অনুরোধ করল। তারা আরও বলল, তাদের পাকিস্থানে যাবার কথা বলা হচ্ছে, কিন্তু সেখানে তারা ভিক্ষার দ্বারায় জীবিকা অর্জন করবার জন্য যেতে কিছুতেই প্রস্তুত নয়। তারা হিন্দুদের সঙ্গে পুনরায় মিশ্রিত হয়ে বসবাস করতে চায়। মহাত্মা যেন অনুগ্রহ ক'রে তারই ব্যবস্থা ক'রে দেন।

মহাত্মা গান্ধী মুসলিম আশ্রয়প্রার্থী-শিবিরগুলো পরিদর্শন কালে দিল্লীর অমুসলমান আশ্রয়প্রার্থী শিবিরগুলোও পরিদর্শন করলেন। এই সব শিবিরে পশ্চিম পাকিস্থান হতে আগত হিন্দু ও শিখরা অবস্থান করছিল। তিনি তাদের সান্ত্বনা দিয়ে তাদের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করবার কথা বললেন এবং প্রতিশোধপরায়ণ না হতে উপদেশ দিলেন।

ইতিপূর্বে মহাত্মা গান্ধী পশ্চিম পাকিস্থানের দুর্গত অমুসলমানদের সংস্পর্শে আরও কয়েকবার গিয়েছিলেন। দিল্লীর ভাঙ্গীকলোনীতে অবস্থানকালে ২১শে জুন তারিখে পণ্ডিত নেহরুকে সঙ্গে নিয়ে হরিদ্বারে পশ্চিম পাকিস্থানের ৩৫ হাজার আশ্রয়প্রার্থীর একটি শিবির তিনি প্রথমবার পরিদর্শন করেন। তারপর মৌলনা আজাদের প্রতিশ্রুতি রক্ষার জন্য তিনি যখন কাশ্মীর যান, তখন যাওয়ার ও ফেরার পথে পাঞ্জাব ও

উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের দুর্গতদের মধ্যে যান। তাছাড়া কাশ্মীর ভ্রমণ কালে ৫ই আগষ্ট ওয়া শহরে উত্তর-পশ্চিম-সীমান্ত প্রদেশ ও পশ্চিম পাঞ্জাবের ৯ হাজার অমুসলমান আশ্রয়প্রার্থীর আর একটি শিবির পরিদর্শন করেছিলেন। মহাত্মা গান্ধী তখন এই সব দুর্গতদের দুঃখে সমবেদনা জানিয়ে, পশুশক্তির নিকটে তাদের নতি স্বীকার না করবার জন্য উপদেশ দিয়েছিলেন। তিনি তাদের স্ব স্ব গৃহ ত্যাগ ক'রে ভয়ে অন্যত্র চলে যেতে নিষেধ করেছিলেন এবং যারা দেশ ছেড়ে অন্যত্র চলে গিয়েছিল, তাদের যতশীঘ্র সম্ভব গৃহে প্রত্যাবর্তন করতে ব'লেছিলেন। আর তাদের অহিংসভাবে সকল বাধা বিঘ্নের সম্মুখীণ হ'তে অনুরোধ জানিয়ে ছিলেন।

দিল্লীতে মহাত্মা গান্ধী একদিকে যেমন প্রায় প্রতিদিনই আশ্রয়প্রার্থী শিবিরগুলো পরিদর্শন ক'রে দুর্গতদের সান্ত্বনা দিতে থাকলেন, অপর দিকে সেই সঙ্গে সঙ্গে প্রতিদিনই তিনি তাঁর প্রার্থনাসভায় হিন্দু, শিখ ও মুসলমানের মধ্যে মিলনের বাণী প্রচার করতে লাগলেন। তিনি হিন্দু ও শিখদের বিদ্বেষ ভুলে মুসলমানদের আপন ভাববার কথা শোনাতে লাগলেন। তিনি বললেন—একথা সত্য যে পাকিস্থানে সংখ্যালঘু হিন্দু ও শিখরা অত্যন্ত দুর্দশাগ্রস্ত হয়েছে, কিন্তু সেই সঙ্গে সঙ্গে এও সত্য যে, পূর্ব পাঞ্জাবে মুসলমানরাও অনুরূপভাবে অত্যাচারিত হয়েছে। এরূপ ক্ষেত্রে উভয় রাষ্ট্রেরই অকপটে দোষ স্বীকার করাই নিষ্পত্তির উপায়। উভয় রাষ্ট্রেরই সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের কর্তব্য সংখ্যালঘুদের রক্ষা করা। এতদিন যারা ভ্রাতৃভাবে পাশাপাশি বাস ক'রে আসছিল এবং জালিয়ান-ওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ডে যাদের রক্ত একত্র প্রবাহিত হয়েছিল, তারা কিরূপে যে পরস্পর শত্রুতে পরিণত হতে পারে, তা ভাবতেও কষ্ট বোধ হয়। হিন্দু ও শিখ আশ্রয়প্রার্থীরা পশ্চিম পাঞ্জাব হতে যে ভাবে

দলে দলে পূর্ব পাঞ্জাবে চলে আসছে, তা চিন্তা করলেও বিহ্বল হতে হয়। জগতের ইতিহাসে এর তুলনা নেই।

অধিবাসী বিনিময়ের কথা উত্থাপন ক'রে তিনি বলতে লাগলেন—লক্ষ লক্ষ হিন্দু মুসলমান ও শিখ স্থানান্তরিত করা—এ চিন্তা করাও যায় না। এরূপ স্থানান্তরিত করা এক অন্যায় বিশেষ।

মহাত্মা গান্ধী হিন্দু ও শিখদের বলতে থাকলেন—পাকিস্থান হতে অমুসলমানদের বিতাড়িত করা হচ্ছে ব'লে ভারতবর্ষ হতে মুসলমান বিতাড়ন করা ঠিক হবে না। পাকিস্থান ভুল পথ গ্রহণ করেছে ব'লে, ভারতবর্ষ কেন সে ভুল কাজ করবে। তবে পাকিস্থানে সংখ্যালঘুদের উপর যে অন্যায় কাজ চলছে, তা উপেক্ষা করবার কথা আমি ভারত গবর্ণমেণ্টকে বলি নি। সেখানকার হিন্দু ও শিখদের যথাসাধ্য রক্ষা করতে ভারত সরকার বাধ্য। কিন্তু পাকিস্থানের পথ অনুসরণ ক'রে ভারতবর্ষ হতে মুসলমান বিতাড়ন ঠিক নয়। তবে যে সকল মুসলমান এখানে থাকতে চায় না, তাদের নিরাপদে সীমান্ত পর্যন্ত পৌছে দেওয়া কর্তব্য।

আজ শুনছি ভারতে মুসলমানদের রাখা হবে না, আজ যখন মুসলমানদের বিরুদ্ধে এই ধ্বনি উঠেছে, কাল পার্শী, খৃষ্টান ও ইউরোপীয়দের অবস্থা কি হবে? অনেক বন্ধু আমার ১২৫ বৎসর বাঁচবার আশা রাখেন, কিন্তু ভারতের এই দ্বেষ ও হানাহানি দেখে আমার আর একমুহূর্তও বাঁচবার ইচ্ছা নেই।

তিনি হিন্দু ও শিখদের ন্যায়পথে থাকবার উপদেশ দিয়ে বলতে লাগলেন—হিন্দু ও শিখরা যদি ন্যায়ানুমোদিত পথে থেকে গৃহত্যাগী মুসলমানদের পুনরায় স্বগৃহে ফিরে আসবার জন্য আহ্বান জানায়, তা হলে তারা শুধু পাকিস্থানের নয়, সমগ্র বিশ্বের শ্রদ্ধা অর্জন করবে।

তিনি আরও বললেন—ন্যায়পথে থেকে সমগ্র হিন্দুও যদি ধ্বংস হয়ে যায়, তাতেও কিছু মনে করবার নেই। প্রতিশোধ না নিয়ে মানুষের কর্তব্য ভগবানের হাতে দুর্বৃত্তকে ছেড়ে দেওয়া। এ ছাড়া অন্য কোন উপায় আমার জানা নেই।

মহাত্মা তাঁর প্রার্থনা সভায় মুসলমান শ্রোতাদের ভয় ত্যাগ ক'রে ভগবানের উপরে সম্পূর্ণ নির্ভর করতে উপদেশ দিতে লাগলেন।

এইসময়ে কুরুক্ষেত্রের আশ্রয়প্রার্থীশিবিরে দুই লক্ষাধিক আশ্রয়প্রার্থী এসে জড়ো হয় এবং দিন দিন আরও আসতে থাকে। আশ্রয় শিবিরটি যেন একটি বড় শহরে পরিণত হয়ে পড়ে। কেন্দ্রীয় সরকার সৈন্য বিভাগকে এর পরিচালনার ভার দেন। মহাত্মা গান্ধী এই সকল আশ্রয়প্রার্থীদের দুঃখদুর্দশার কথা শুনে সেখানে যাবার জন্য ব্যগ্র হয়ে উঠেন। কিন্তু এইসময়ে নয়াদিল্লীতে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠক চলতে থাকায় এবং ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠকে তাঁর উপস্থিতির একান্ত প্রয়োজন থাকায় তিনি কুরুক্ষেত্র যেতে পারলেন না। শ্রীযুক্ত ঘনশ্যামদাস বিড়লার পরামর্শ অনুযায়ী তিনি ১২ই ডিসেম্বর কুরুক্ষেত্রের আশ্রয়প্রার্থীদের উদ্দেশ্যে এক বেতার বক্তৃতা দিলেন। ভারতে এটাই তাঁর সর্বপ্রথম বেতার বক্তৃতা। বহু বৎসর পূর্বে গোলটেবিল বৈঠকের সময় তিনি লণ্ডনে আর একবার মাত্র বেতার বক্তৃতা করেছিলেন।

এইদিন বেতার বক্তৃতায় মহাত্মা গান্ধী বললেন—আজ দীপালী উৎসবের দিন। কিন্তু আজ আপনাদের পক্ষে কি অন্য কারও পক্ষে দীপ জ্বালা উচিত নয়। এই শিবিরে আপনারা যদি পরস্পর ভ্রাতৃভাব নিয়ে বাস করতে পারেন, তবেই আপনাদের উৎসব সুসম্পন্ন হবে।

শিবিরে যাতে শৃঙ্খলা বজায় থাকে, তার জন্য আপনাদের সাহায্য করতে হবে। শিবির পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখার দায়িত্বও আপনাদের হাতেই। কুরুক্ষেত্র শিবিরের স্ত্রী, পুরুষ ও শিশুদের নিকটে আমার অনুরোধ—তাঁরা যেন শিবির পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রেখে শিবিরের চিকিৎসক ও পরিচালকদের সহায়তা করেন। আর আপনারা, যে, যে পরিমাণ রেশন পান তাতেই সন্তুষ্ট হবেন এবং অতিরিক্ত দাবী করবেন না। একত্র রন্ধনের ব্যবস্থা করবেন, তাতে পরস্পরের সাহায্য হবে। অনেকেই হয়ত আশ্রয়প্রার্থীশিবিরে অলস ভাবে ব'সে ব'সে দিন কাটাচ্ছেন। তাদের নিকটে আমার অনুরোধ সুতাকাটা কি অন্য যে কোন কাজ গ্রহণ ক'রে তারা যেন কেন্দ্রীয় শিবিরকে কতক পরিমাণেও আত্মনির্ভরশীল ক'রে গবর্ণমেণ্টকে কিছুটা সাহায্য করেন।

মহাত্মা গান্ধী একদিকে তাঁর প্রার্থনা সভায় দিনের পর দিন হিন্দু-মুসলমান ও শিখ এই তিন সম্প্রদায়ের মিলনের জন্য যেমন আবেদন জানাতে লাগলেন, অপর দিকে তেমনি শীত এসে পড়ায়, পাকিস্তান হতে আগত অমুসলমান এবং দিল্লীর দুর্গত মুসলমান আশ্রয়প্রার্থীদের জন্য কম্বল চাইতে লাগলেন। তাঁর এই আহ্বানে দেশের চারিদিক হতেই দিল্লীতে কম্বল এসে জড়ো হতে লাগল। হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে সকলেই কম্বল পাঠালেন এবং কেহ কেহ কম্বল কিনবার জন্য মহাত্মার নিকটে টাকাও প্রেরণ করলেন।

১৫ই অক্টোবর মহাত্মা গান্ধী তাঁর প্রার্থনা সভায় কম্বলের কথা উত্থাপন ক'রে বললেন—আমি কম্বল এবং কম্বল কিনবার জন্য টাকা খুবই পাচ্ছি। এক ভগিনী কম্বল কিনবার জন্য দু' হাজার টাকার একটি চেক পাঠিয়ে দিয়েছেন। দু'জন মুসলমান বন্ধুও কিছু কম্বল

এবং আরও কম্বল কিনবার জন্য কিছু টাকা পাঠিয়েছেন। আমি তাঁদের অনুরোধ করেছিলাম, তাঁরা নিজেরাই যেন দুর্গতদের মধ্যে ঐগুলো বণ্টন ক'রে দেন। উত্তরে তাঁরা বিশেষ অনুরোধ ক'রে জানিয়েছেন—আমি যেন ঐগুলো হিন্দু ও শিখ আশ্রয়প্রার্থীদের মধ্যে বিতরণ করি। তাঁরা আরও জানিয়েছেন—এক সময়ে নাকি তাঁরা আমার মধ্যে অন্যায় দেখতে পেতেন, কিন্তু এখন তাঁদের এই বিশ্বাস হয়েছে যে, আমি সকলেরই মিত্র, কারও শত্রু নই।

এর পর মহাত্মাজী বললেন—একথা ঠিক যে, হাঙ্গামায় অনেক মুসলমানের বুদ্ধি বিবেচনা ভ্রষ্ট হয়। কিন্তু তাই ব'লে কতক লোকের দোষে, তারা সংখ্যায় যত অধিকই হউক না কেন, সকলকে দোষী বলা যায় না। বহু হিন্দু ও শিখ বলেছেন যে, সহৃদয় মুসলমান বন্ধুদের সাহায্যে তাঁদের জীবন রক্ষা পেয়েছে। ঠিক এমনি অনেক মুসলমানও বলেছেন, হিন্দু ও শিখ বন্ধুদের সাহায্যে তাঁরা বেঁচে গেছেন। সকল স্থানেই এরূপ সৎপ্রকৃতির হিন্দু, মুসলমান ও শিখ যথেষ্ট রয়েছেন।

এই সময়ে ভারত গবর্ণমেণ্টও দিল্লীর দাঙ্গা দমন করবার জন্য কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করলেন। প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত নেহরু ও সহকারী প্রধানমন্ত্রী সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল প্রায় প্রতিদিনই মহাত্মার সঙ্গে সাক্ষাৎ ক'রে উপদ্রব দমনের জন্য উপদেশ নিতে লাগলেন। এইভাবে ভারত গবর্ণমেণ্টের দৃঢ়তায় ও মহাত্মা গান্ধীর শান্তি অভিযানের ফলে দিল্লীর অবস্থা কয়েক দিনেই সম্পূর্ণ শান্ত হ'য়ে এল এবং কোথাও আর কোনরূপ উপদ্রব দেখা দিল না। কিন্তু এই শান্ত অবস্থার মধ্যেই ১৯শে অক্টোবর একজন মুসলমান হেল্‌থ অফিসার কর্তব্যকর্মে রত থাকাকালে কয়েকজন দুর্বৃত্ত গিয়ে তাঁকে হত্যা করল। স্বাস্থ্য-সচিব রাজকুমারী অমৃত কাউর ঐ দিন রাত্রেই মহাত্মাকে এই

সংবাদ দিলেন এবং তিনি আরও জানালেন যে, উক্ত মৃত ব্যক্তির স্ত্রী ও পুত্রকন্যা এমনি কাতর হয়ে পড়েছে যে, তারা বলেছে, তাদেরও হত্যা করা হোক্। পরদিন মহাত্মার সাপ্তাহিক মৌন দিবস থাকায় তিনি এক লিখিত অভিভাষণে প্রার্থনা সভায় এই হত্যাকাণ্ডের উল্লেখ ক'রে বললেন—বাহ্যত দিল্লীর অবস্থার উন্নতি হয়েছে দেখা গেলেও প্রকৃতপক্ষে অবস্থার উন্নতি হয় নে। যতদিন না এইরূপ শোচনীয় ঘটনা বন্ধ হবে, ততদিন পর্যন্ত দিল্লীতে প্রকৃত শান্তি এসেছে বলা যাবে না। কোরাণের নির্দেশ অনুযায়ী মৃত ব্যক্তির শেষকৃত্য সম্পাদন করবার জন্য যথেষ্ট সংখ্যক মুসলমান পাওয়া যাচ্ছে না শুনে আমি শিউরে উঠছি। সংখ্যালঘুদের ভীতিপ্রদর্শন সংখ্যাগরিষ্ঠদের পক্ষে ভীরুতারই লক্ষণ।

আরও কিছুদিন কেটে গেল। মহাত্মা গান্ধীর শান্তি অভিযানের ফলে দিল্লীর অবস্থা ক্রমশ শান্ত হয়ে এল। দিল্লীর দুর্গত মুসলমানরা, যারা হিন্দু ও শিখদের অত্যাচারের ভয়ে আশ্রয়প্রার্থী শিবিরে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিল, তাদেরও কেহ কেহ ক্রমে তাদের পূর্ব বাসস্থানে ফিরে আসতে লাগল।

দিল্লীর উপরে এই শান্তভাব দেখা দিলেও সত্যদর্শী মহাত্মা কিন্তু দেখতে পেলেন ভিতরে ভিতরে গোলমাল ঠিক রয়েই গিয়েছে। যে কোনও দিন তা আবার আত্মপ্রকাশ করতে পারে। লোকের ঠিক নৈতিক পরিবর্তন ঘটে নি।

তাই তিনি অনন্যোপায় হয়ে, হিন্দু, মুসলমান ও শিখ সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রকৃত মিলন আনবার জন্য ১৩ই জানুয়ারী বেলা ১১টার অল্প পরে সত্যাগ্রহীর শেষ অস্ত্র অনশন আরম্ভ করলেন এবং এ সম্পর্কে জানালেন—যখন বুঝব যে বাইরের চাপ ব্যতীতই কর্তব্য বোধে অনুপ্রাণিত

হয়ে, দিল্লীর বিভিন্ন সম্প্রদায়ের অন্তরের মিলন হয়েছে, তখনই আমি অনশন ত্যাগ করব।

মহাত্মা দিল্লীর সংখ্যালঘুদের রক্ষা করবার জন্য অনশন করলেন, দিল্লী নগরীর সহিত সমগ্র ভারত সঙ্গে সঙ্গে বিচলিত হয়ে উঠল। দেশের নেতৃবৃন্দ ও জনসাধারণ হিন্দু, শিখ ও মুসলমানের প্রকৃত মিলনের পথ খুঁজতে ব্যগ্র হয়ে উঠলেন।

পণ্ডিত নেহরু দিল্লীর মুসলমান আশ্রয়প্রার্থীদের এক সপ্তাহের মধ্যেই তাদের পূর্ব বাসস্থানে নিরাপদে রাখবার প্রতিশ্রুতি দিলেন। হিন্দু-মুসলমান মিলনের পথ সহজতর করবার জন্য ভারত গবর্ণমেণ্ট, অন্যায়ভাবে কাশ্মীর আক্রমণ করার জন্য পাকিস্থানের প্রাপ্য যে ৫৫কোটী টাকা আটকে রেখেছিল, তাও পাকিস্থানকে দিয়ে দিল। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি স্থাপনে মহাত্মার ব্রত যাতে সাফল্য লাভ করে এবং তাঁর জীবন বিপন্ন হবার পূর্বেই যাতে তিনি অনশন ভঙ্গ করতে পারেন, সে জন্য ভারতের সর্বত্রই মন্দিরে, মসজিদে, গির্জায়, গুরুদ্বারে প্রভৃতি ধর্মস্থানে প্রার্থনার অনুষ্ঠান হ'তে লাগল।

কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টের মন্ত্রীবর্গ যেমন মহাত্মা গান্ধীকে শান্তি রক্ষার প্রতিশ্রুতি দিলেন, দিল্লীর শান্তি কমিটিও মহাত্মার নিকটে এক লিখিত প্রতিশ্রুতিতে জানাল—আমরা মুসলমানদের জীবন, সম্পত্তি ও ধর্ম-বিশ্বাস রক্ষা ক'রে চলব এবং দিল্লীতে যে সকল ঘটনা ঘটেছে তা আর কখনও ঘটতে দেব না।

দিল্লীর ২ লক্ষ নাগরিকও একটি প্রতিজ্ঞা পত্রে স্বাক্ষর ক'রে জানাল যে, ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত ভাবে তারা দিল্লীতে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি অক্ষুণ্ণ রাখতে যত্নবান থাকবে।

এই সকল প্রতিশ্রুতি পেয়ে মহাত্মা ১৮ই জানুয়ারী বেলা ১২-৪০

মিনিটের সময় অনশন ত্যাগ করলেন। মহাত্মা গান্ধী অনশন ভঙ্গ করলেন, ভারত তথা সমগ্র বিশ্ব শান্তি ও স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচল।

মহাত্মা গান্ধী যে সময়ে দিল্লীর মুসলমানদের রক্ষা করবার জন্য এবং অমুসলমানদের হৃদয়ের পরিবর্তন আনবার জন্য আমরণ অনশন গ্রহণ ক'রে নিজে দ্রুতপদে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাচ্ছিলেন, ঠিক সেই সময়ে পাঞ্জাবের গুজরাটে একটি অমুসলমান আশ্রয়প্রার্থীবাহী ট্রেণকে আক্রমণ ক'রে মুসলমানরা একসঙ্গে দুই সহস্র লোককে হত্যা করল। এতে ভারতের একশ্রেণীর অমুসলমান জনসাধারণ মহাত্মা গান্ধীর উপরে বিরক্ত হয়ে উঠল এবং তারা পাকিস্থানে হিন্দু ও শিখদের নির্যাতনের কথা উল্লেখ ক'রে এবং এ সম্পর্কে পাকিস্থান গবর্ণমেণ্টের নিষ্ক্রিয়তার কথা ব'লে, মহাত্মার এই অনশনকে পক্ষপাতমূলক ও অহেতুক মুসলিমপ্রীতি বা তোষামোদ ব'লে অভিহিত করল। শুধু এইখানেই এর পরিসমাপ্তি ঘটল না। মহাত্মার অনশন ভঙ্গের ২ দিন পরে পশ্চিম পাঞ্জাবের একজন সর্বহারা দিল্লীতে মহাত্মার শান্তি-অভিযানে কাণ্ডজ্ঞান হারিয়ে, মহাত্মার প্রার্থনা সভায় তাঁকে লক্ষ্য ক'রে একটি দেশী হাতবোমা ছুড়তেও ছাড়ল না। সৌভাগ্যবশতঃ এই ব্যাপারে মহাত্মা অক্ষত থেকে গেলেন এবং তাঁর প্রার্থনা সভায় তাঁর স্বভাবমত তিনি অবিচলিতই থাকলেন।

পরদিন প্রার্থনা সভায় মহাত্মা বোমানিক্ষেপকারীর কথা উত্থাপন ক'রে বললেন—যেই এরূপ ক'রে থাক, আমি তার মঙ্গল কামনাই করছি। পুলিশ ইনেস্‌পেক্‌টার জেনারেলকেও আমি ব'লে দিয়েছি যেন কোন রকম তাকে পীড়ন করা না হয়। তাকে বুঝিয়ে সৎপথে আনার চেষ্টা করা উচিত।

মহাত্মার প্রতি এই বোমা নিক্ষেপ ছিল, ২০শে জানুয়ারী তারিখের

ঘটনা। এর পর আরও কয়েকদিন কেটে গেল। মহাত্মা প্রতিদিনই হিন্দু, মুসলমান ও শিখ সম্প্রদায়ের মধ্যে পরস্পরের মিলন-বন্ধন সুদৃঢ়তর করবার জন্য বলতে লাগলেন। ফলে রাজধানী দিল্লী নগরী তথা ভারতের অন্যান্য স্থানেও সাম্প্রদায়িক মিলনের সুফল দেখা দিল। মহাত্মার দিল্লীর কাজ সমাধা হয়ে গেল। বাকি রইল পাঞ্জাবের দুর্গত অঞ্চল পরিভ্রমণ। ২৫শে জানুয়ারী তারিখে মহাত্মা তাঁর প্রার্থনা সভায় বললেন—পাকিস্থান একটি ভিন্ন রাষ্ট্র, সুতরাং পাকিস্থান গবর্ণমেণ্টের অনুমতি পেলেই আমি পাকিস্থানের দুর্গত অঞ্চলে যাব। যতদিন না এই অনুমতি পাচ্ছি, ততদিন দিল্লী-বাসীদের সম্মতি থাকলে আমি একবার কয়েকদিনের জন্য ওয়ার্ধায় যেতে ইচ্ছা করি।

দিল্লীর কাজ শেষ হওয়ায় মহাত্মা ওয়ার্ধায় যাবেন প্রায় ঠিক। কিন্তু তা আর হয়ে উঠল না। ৩০শে জানুয়ারী অপরাহ্ণে এক হৃদয়-বিদারক অভাবনীয় দুর্ঘটনা ঘটে গেল। অপরাহ্ণে ৫-৫ মিনিটের সময় মহাত্মা বিড়লা-ভবন থেকে তাঁর প্রার্থনা সভায় যাবার কালে মহারাষ্ট্র দেশীয় নাথুরাম বিনায়ক গডসে নামক এক নর-কলঙ্কের হাতে গুলিবিদ্ধ হলেন এবং এই গুলিবিদ্ধ হবার ৩৫ মিনিট পরে তিনি ইহলোক ত্যাগ ক'রে চলে গেলেন।

মহাত্মা গান্ধী দিল্লীতে মুসলমানদের রক্ষা করবার জন্য যে আমরণ অনশন করেছিলেন, তাতে যে ক'জন তথাকথিত হিন্দু, হিন্দুত্বের দরদ দেখিয়ে মহাত্মার উপরে দোষারোপ করেছিল, মহাত্মার হত্যাকারী লোকটিও ছিল তাদেরই মধ্যেকার একজন চরমপন্থী। প্রতিশোধপরায়ণ দিল্লীবাসী অমুসলমানদের, মুসলমান নিধনে বাধা দেওয়ার জন্য তাদের প্রতিশোধ গিয়ে পৌঁছেছিল শেষে মহাত্মার

দিল্লীর শান্তি-সাধনায় মহাত্মা গান্ধীর আত্মাহুতি।

উপরে। মানবতার সাধক মহামানব মহাত্মা গান্ধী সহাস্তে তা গ্রহণ করবার জন্ত নিজের বুক পেতে দিলেন।

আমরা শুনে আসছি, কবে এক অনাদি কালে, কোন সে পৌরাণিক যুগে, দেব ও অসুরের সমুদ্র-মন্থনের ফলে যে হলাহল উত্থিত হয়েছিল, দেবাদিদেব মহাদেব তা পান ক'রে পৃথিবীকে নাকি ধ্বংসের হাত হ'তে রক্ষা করেছিলেন। অতীতের সেই সমুদ্র-মন্থনের হলাহলের ন্তায় আমাদের দিনে এই ভারতের একটি সাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক দলের "প্রত্যক্ষ-সংগ্রাম" ঘোষণা করবার ফলে, ভারত মথিত ক'রে দিকে দিকে যে সাম্প্রদায়িক হানাহানির হলাহল উথলে উঠে, এ যুগের পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব তা পান ক'রে ভারতকে বাঁচাবার জন্ত ছুটে এলেন এবং ভারতের সাম্প্রদায়িক হানাহানির সেই গরল তিনি আকণ্ঠ পান করলেন। দেবাদিদেব মহাদেব ছিলেন—মৃত্যুঞ্জয়ী দেবতা, তিনি অমর। তাই সমুদ্র-মন্থনের হলাহল কণ্ঠে ধারণ ক'রে মৃত্যুঞ্জয়ী হয়ে নীলকণ্ঠ হয়েছিলেন। এ যুগের যিনি মহামানব তিনি ছিলেন কিন্তু এই মরজগতেরই একজন। তাই তিনি সাম্প্রদায়িকতার বিষ পান ক'রে মৃত্যুকে এড়াতে পারলেন না, শেষ পর্যন্ত নিজের জীবন দান করলেন।

দু' হাজার বছর আগে পৃথিবীতে আর একবার মাত্র এইরূপ এক মহামৃত্যু ঘটেছিল। সেদিন ভগবানের প্রিয়পুত্র যীশুও এমনি ক'রেই ক্ষমা ও প্রেমের জন্তই জীবনদান করেছিলেন। তারপর বহু শত বৎসর পরে মহাত্মার এই মৃত্যুর মধ্য দিয়ে সেই মহামরণের আর

একবার পুনরাবৃত্তি ঘটল। সেদিন যারা যীশুকে নির্দয়ভাবে ক্রুশে বিদ্ধ ক'রে হত্যা করেছিল, জগৎ আজও সেই সম্প্রদায়ের লোককে ক্ষমার চক্ষে দেখতে পারে না। এযুগের সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব মহাত্মা গান্ধীর নৃশংস হত্যাকাণ্ডেও ভারতের হিন্দুসমাজের ললাটে যে কলঙ্কপঙ্কের ছাপ পড়ল, তাও কোনদিন মুছবে ব'লে মনে হয় না। হিন্দুর গৌরবোজ্জ্বল শুভ্র ললাটের একপার্শ্বে এই কলঙ্কের কাল দাগ চিরকালের জন্য থেকে গেল।

বুদ্ধের অহিংসা ও যীশুর ক্ষমা একটি দেহে রূপ পরিগ্রহ ক'রে যেন মহাত্মা গান্ধী আমাদের এই যুগে এসে আবির্ভূত হয়েছিলেন এবং তিনি নিজের দীর্ঘজীবনের বহুবিধ ঘটনার মধ্য দিয়ে সত্য, অহিংসা, ক্ষমা ও প্রেমের প্রয়োগ দেখিয়ে গেলেন। আঘাতের বদলে আঘাত না হেনে ক্ষমাও প্রেমের দ্বারাই প্রতিপক্ষকে জয় করতে হবে, তবেই এই ধরণীর ধূলির বুকে "রামরাজ্য" বা স্বর্গরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হবে—এই ছিল মহাত্মার অনুসৃত সত্য ও অহিংসা নীতির মর্মবাণী। হিংসা, দ্বেষ ও রণজর্জরিত পৃথিবীর বুকে মহাত্মার এই বাণী আজই শুধু যে, শান্তির এক আশ্চর্য প্রলেপ দিচ্ছে তা নয়, অনাগতকালের জন্যও তা সঞ্চিত হয়ে থাকবে এবং আজকের ন্যায় ভাবীযুগের মানুষও এই মহামানবের আত্মিক প্রভাব বিস্ময়ের সহিত অনুভব ক'রে ধন্য হবে।

## বইখানি সম্বন্ধে কয়েকটি অভিমত—

নোয়াখালি-ত্রিপুরায়, বিহারে, কলিকাতায় এবং দিল্লী সহরে সাম্প্রদায়িক অশান্তি ও উপদ্রবের প্রকোপ প্রশমিত করিবার জন্য গান্ধীজী যে শান্তি-অভিযানে বাহির হইয়াছিলেন, বর্ত্তমান গ্রন্থ তাহারই বিবরণ সংগ্রহ ...... নোয়াখালিতে গান্ধীজীর শান্তি-অভিযানে গ্রন্থকার উপস্থিত ছিলেন এবং প্রত্যক্ষে দেখিবার ও শুনিবার সুযোগ পাইয়াছেন, কলিকাতাতেও তাঁহার সে সুযোগ হইয়াছে। সুতরাং তাঁহার এই বিবরণের বিশেষত্ব আছে। তাঁহার রচনাভঙ্গীর গুণে ইহা বিচ্ছিন্ন ঘটনা সংগ্রহের মত মনে হয় না, পরন্তু সমস্তটাই এক অবিচ্ছিন্ন ঘটনা প্রবাহের বর্ণনা বলিয়া বোধ হয়। তাহাতেই গ্রন্থখানি সুখপাঠ্য হইয়াছে।

**আনন্দবাজার পত্রিকা**

......বইটি বিয়োগান্ত গল্পের মতই মর্ম্মস্পর্শী। কোন কোন স্থানে লেখক স্বয়ং গান্ধীজীর দলের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। কাজেই প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার আলোকে গ্রন্থখানা যথেষ্ট প্রামাণ্য হইয়াছে সন্দেহ নাই। তদুপরি তাঁহার প্রাঞ্জল ভাষা ও মধুর বর্ণন-নৈপুণ্যে এবং মুদ্রণ পারিপাট্যে গ্রন্থখানি সবিশেষ চিত্তাকর্ষক হইয়াছে।

**দেশ**

......জগতের ইতিহাসে এই অভিযান স্থান পাইবে। রচনা হৃদয়-গ্রাহী; ভাষা প্রাঞ্জল।

**কবিশেখর শ্রীকালিদাস রায়**

......তোমার "মহাত্মা গান্ধীর শান্তি-অভিযান" পড়িয়া ফেলিলাম। উপন্যাসের ন্যায় কৌতূহল উদ্দীপক ও কবিতার ন্যায় মধুর হইয়াছে। আরম্ভ করিলে শেষ না করিয়া থাকা যায় না। বইখানি চমৎকার হইয়াছে।*

**কবি শ্রীকুমুদ রঞ্জন মল্লিক**

আপনার বইখানি "মহাত্মা গান্ধীর শান্তি অভিযান" পড়লাম। ভারতবর্ষের মানুষ যখন উন্মত্ত আত্মঘাতী, জীবনের পাপ ক্রোধ হিংসা যখন প্রলয় তাণ্ডবে দেশকে শ্মশান করে তুলেছিল, তখন সমগ্র ভারতবর্ষের যুগযুগান্তর কল্পকল্পান্তরের সাধনা পুণ্য ওই একটি মহামানবের জীবনকে আশ্রয় করে নিজেকে প্রকাশিত করেছে, তাঁর স্বকীয় আত্মিক শক্তিতে প্রাণময় হয়ে জয়যুক্ত হয়েছে। ......এই উন্মত্ত হিংস্র অন্ধ পাপ প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে ভারতের আত্মিক-সাধনার মহনীয় দ্বন্দ্ব বাস্তবের এই ধর্ম্মযুদ্ধকে স্বচক্ষে আপনি দেখেছেন, একক মহারথীর পদচিহ্ন অনুসরণ করেছেন, তাঁর সঙ্গে থাকার পুণ্য অর্জ্জন করেছেন, এ আপনার মহৎ সৌভাগ্য। সেই পুণ্য কথা ভারতের এবং পৃথিবীর ইতিহাসে এক উজ্জ্বল অধ্যায়। সেই অধ্যায় রচনার পুণ্য মূল্যবান উপাদান সংগ্রহ করে রাখলেন আপনি আপনার বইখানিতে "মহাত্মা গান্ধীর শান্তি অভিযানে"।*

**তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়**

......তোমার "মহাত্মা গান্ধীর শান্তি-অভিযান" পাঠ করিয়া কৃতার্থ হইলাম। এই মরণজয়ী মহামানবের কথা আলোচনা করিয়া তুমি নিজে ধন্য হইয়াছ এবং সেই সঙ্গে বাঙ্গলা ভাষা ও বাঙ্গালী জাতিকে ধন্য করিয়াছ।*

**পণ্ডিত শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, সাহিত্যরত্ন**

......বইখানি বেশ ভাল হয়েছে। অল্প পরিসরে অনেক কথা সংযম ও শ্রদ্ধার সহিত নিপুণভাবে বলা হয়েছে

**শ্রীরতনমণি চট্টোপাধ্যায়**

সম্পাদক, হরিজন ( বাঙলা সংস্করণ )।

---

তারকাচিহ্নিত অংশগুলি গ্রন্থকারের নিকট লিখিত পত্র থেকে উদ্ধৃত।